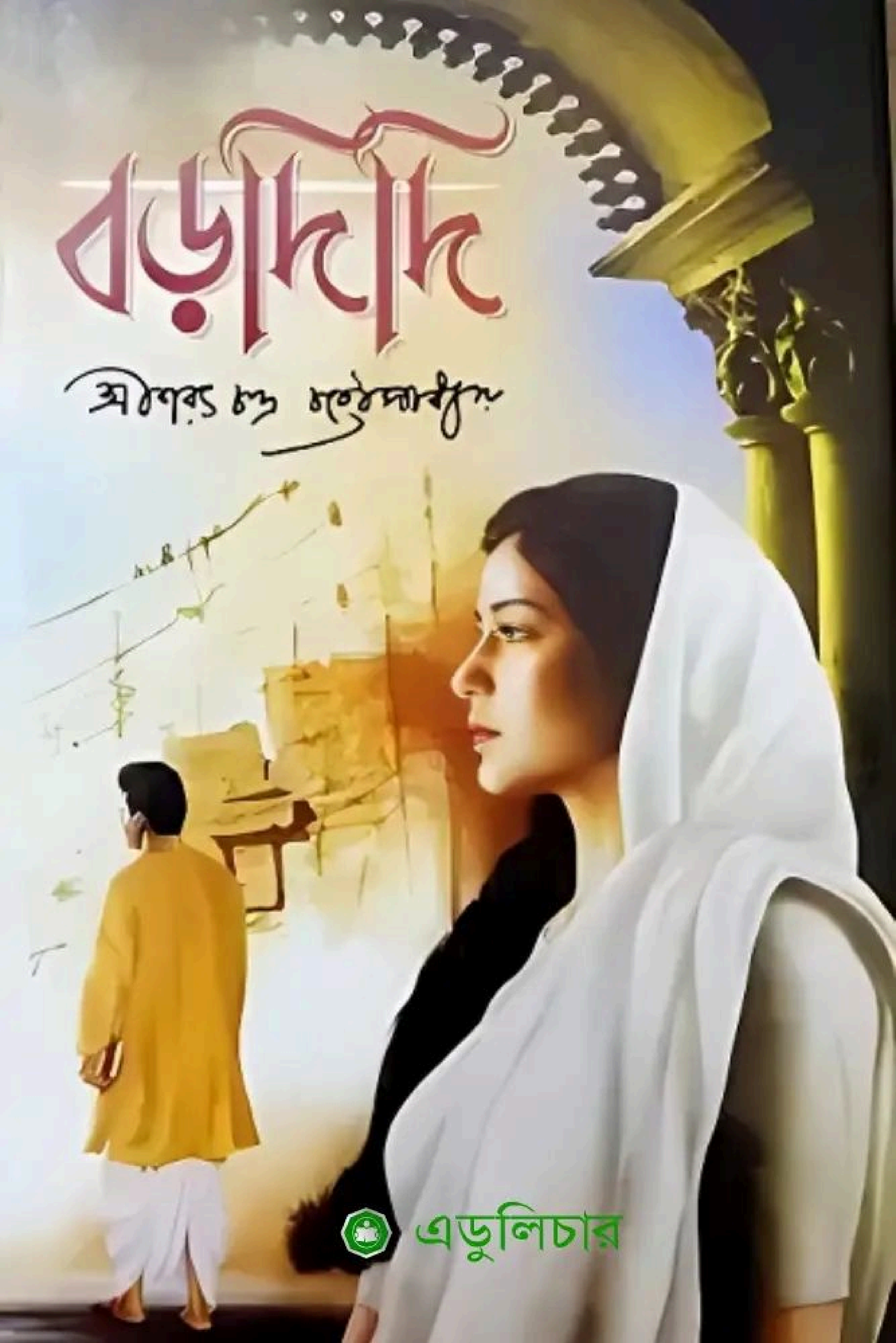

বড়দিদি
শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এডুলিচার

# বড়দিদি

# প্রথম পরিচ্ছেদ

এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদাসর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন–সে যেন আবশ্যক অনুসারে খড় যোগাইয়া দেয়।

গৃহস্থ-কন্যারা মাটির দীপ সাজাইবার সময় যেমন তৈল ও সলিতা দেয়, তেমনি তাহার গায়ে একটি কাঠি দিয়া দেয়। প্রদীপের শিখা যখন কমিয়া আসিতে থাকে, –এই ক্ষুদ্র কাঠিটির তখন বড় প্রয়োজন–উসকাইয়া দিতে হয়; এটি না হইলে তৈল এবং সলিতা সত্ত্বেও প্রদীপের জ্বলা চলে না।

সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিও কতকটা এইরূপ। বল, বুদ্ধি, ভরসা তাহার সব আছে তবু সে একা কোন কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে না। খানিকটা কাজ যেমন সে উৎসাহের সহিত করিতে পারে, বাকিটুকু সে তেমন নীরব আলস্যভরে ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে। তখনই একজন লোকের প্রয়োজন–সে উসকাইয়া দিবে।

সুরেন্দ্রের পিতা সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করিতেন। এই বাঙলাদেশের সহিত তাঁহার বেশি কিছু সম্বন্ধ ছিল না। এইখানেই সুরেন্দ্র তাহার কুড়ি বৎসর বয়সে এম.এ. পাশ করে; কতকটা তাহার নিজের গুণে, কতকটা বিমাতার গুণে। এই বিমাতাটি এমন অধ্যবসায়ের সহিত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিতেন যে, সে অনেক সময় বুঝিতে পারিত না যে, তাহার নিজের স্বাধীন সত্তা কিছু আছে কি না। সুরেন্দ্র বলিয়া কোনো স্বতন্ত্র জীব এ জগতে বাস করে, না, এই বিমাতার ইচ্ছাই একটি মানুষের আকার ধরিয়া কাজকর্ম, শোয়া-বসা, পড়াশুনা, পাশ প্রভৃতি সারিয়া লয়। এই বিমাতাটি, নিজের সন্তানের প্রতি

কতকটা উদাসীন হইলেও, সুরেন্দ্রের হেফাজতের সীমা ছিল না। থুথু ফেলাটি পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। এই

কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রীলোকটির শাসনে থাকিয়া সুরেন্দ্র নামে লেখাপড়া শিখিল, কিন্তু আত্মনির্ভরতা শিখিল না। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না। কোনো কর্মই যে তাহার দ্বারা সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে, ইহা সে বুঝিত না। কখন যে তাহার কি প্রয়োজন হইবে এবং কখন তাহাকে কি করিতে হইবে, সেজন্য সে সম্পূর্ণরূপে আর একজনের উপর নির্ভর করিত। ঘুম পাইতেছে, কি ক্ষুধা বোধ হইতেছে, অনেক সময় এটাও সে নিশ্চিত ঠাহর করিতে পারিত না। জ্ঞান হওয়া অবধি, তাহাকে বিমাতার উপর ভর করিয়া এই পঞ্চদশ বর্ষ কাটাইতে হইয়াছে। সুতরাং বিমাতাকে তাহার জন্য অনেক কাজ করিতে হয়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাইশ ঘন্টা তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখবিকৃতি, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার বৎসর, পূর্ব হইতেই তাহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ রাখিবার জন্য তাঁহার নিজের নিদ্রাসুখ বিসর্জন দিতে হইত । আহা, সপত্নীপুত্রের জন্য কে কবে এত করিয়া থাকে! পাড়া-প্রতিবাসীরা একমুখে রায়গৃহিনীর সুখ্যাতি না করিয়া উঠিতে পারে না।

সুরেন্দ্রের উপর তাঁহার আন্তরিক যত্নের এতটুকু ত্রুটি ছিল না-তিরস্কার-লাঞ্ছনার পর-মুহূর্তে যদি তাহার চোখ-মুখ ছলছল করিত, রায়গৃহিণী সেটি জ্বরের পূর্বলক্ষণ নিশ্চিত বুঝিয়া, তিন দিনের জন্য তাহার সাগু ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মানসিক উন্নতি এবং শিক্ষাকল্পে, তাঁহার আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সুরেন্দ্রের অঙ্গে পরিষ্কার কিংবা আধুনিক রুচি-অনুমোদিত বস্ত্রাদি দেখিলেই তাহার শখ এবং বাবুয়ানা করিবার গুপ্ত ইচ্ছা তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যাইত, এবং সেই মুহূর্তেই দুই-তিন সপ্তাহের জন্য সুরেন্দ্রের বস্ত্রাদি রজক-ভবনে যাওয়া নিষিদ্ধ হইত।

এমনিভাবে সুরেন্দ্রের দিন কাটিতেছিল । এমনি সস্নেহ-সতর্কতার মাঝে তাহার কখনও কখনও মনে হইত, এ জীবনটা বাঁচিবার মত নহে; কখনও বা সে মনে মনে ভাবিত, বুঝি এমনি করিয়াই সকলের জীবনের প্রভাতটা অতিবাহিত হয় ।

কিন্তু এক-একদিন আশেপাশের লোকগুলো গায়ে পড়িয়া তাহার মাথায় বিভিন্ন ধারণা গুঁজিয়া দিয়া যাইত।

একদিন তাহাই হইল । একজন বন্ধু তাহাকে পরামর্শ দিল যে, তাহার মত বুদ্ধিমান ছেলে বিলাত যাইতে পারিলে, ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা আছে। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সে অনেকের উপকার করিতে পারে। কথাটা সুরেন্দ্রের মন্দ লাগিল না। বনের পাখির চেয়ে পিঞ্জরের পাখিটাই বেশি ছটফট করে। সুরেন্দ্র কল্পনার চক্ষে যেন একটু মুক্ত বায়ু, একটু স্বাধীনতার আলোক দেখিতে পাইতেছিল, তাই তাহার পরাধীন প্রাণটা উন্মত্তের মত পিঞ্জরের চতুর্দিকে ঝটপট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সে পিতাকে আসিয়া নিবেদন করিল যে, তাহার বিলাত যাইবার উপায় করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে যে-সকল উন্নতির আশা ছিল–তাহাও সে কহিল। পিতা কহিলেন, ভাবিয়া দেখিব। কিন্তু গৃহিনীর ইচ্ছা একেবারে প্রতিকূল। তিনি পিতা-পুত্রের মাঝখানে ঝড়ের মত আসিয়া পড়িয়া এমনি অট্টহাসি হাসিলেন যে, দুইজনেই স্তম্ভিত হইয়া গেল!

গৃহিণী কহিলেন, তবে আমাকেও বিলাত পাঠাইয়া দাও–না হইলে সুরোকে সামলাইবে কে? যে জানে না, কখন কি খাইতে হয়, কখন কি পরিতে হয়, তাকে একলা বিলাত পাঠাইতেছ? বাড়ির ঘোড়াটাকে সেখানে পাঠান যা ওকে পাঠানও তাই। ঘোড়া-গরুতে বুঝিতে পারে যে, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, কি ঘুম পাইয়াছে – তোমার সুরো তাও পারে না। তারপর আবার হাসি।

হাস্যের আধিক্য-দর্শনে রায়মহাশয় বিষম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্রনাথও মনে করিল যে, এরূপ অকাট্য যুক্তির বিপক্ষে কোনরূপ প্রতিবাদ করা যায় না । বিলাত যাইবার আশা সে ত্যাগ করিল। তাহার বন্ধু এ কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল। কিন্তু বিলাত যাইবার আর কোন উপায় আছে কি না, তাহাও সে বলিয়া দিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে কহিল যে, এরূপ পরাধীনভাবে থাকার চেয়ে ভিক্ষা করিয়া

খাওয়া শ্রেয়; এবং ইহাও নিশ্চয় যে, এরূপ সম্মানের সহিত যে এম.এ. পাশ করিতে পারে–উদরান্নের জন্য তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না।

সুরেন্দ্র বাটী আসিয়া এ কথা ভাবিতে বসিল। যত ভাবিল তত সে দেখিতে পাইল যে, বন্ধু ঠিক বলিয়াছে–ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল । সবাই কিন্তু বিলাত যাইতে পারে না, কিন্তু এমন জীবিত ও মৃতের মাঝামাঝি হইয়াও সকলকে দিন কাটাইতে হয় না।

একদিন গভীর রাত্রে সে স্টেশনে আসিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া গাড়িতে বসিল এবং ডাকযোগে পিতাকে পত্র লিখিয়া দিল যে, কিছুদিনের জন্য সে বাড়ি পরিত্যাগ করিতেছে, অনর্থক অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ লাভ হইবে না এবং সন্ধান পাইলেও যে সে বাটীতে ফিরিয়া আসিবে, এরূপ সম্ভাবনাও নাই।

রায়মহাশয় গৃহিণীকে এ, পত্র দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, সুরো এখন মানুষ হইয়াছে–বিদ্যা শিখিয়াছে–পাখা বাহির হইয়াছে–এখন উড়িয়া পলাইবে না ত কখন পলাইবে!

তথাপি তিনি অনুসন্ধান করিলেন–কলিকাতায় যাহারা পরিচিত ছিল, তাহাদিগকে পত্র দিলেন; কিন্তু কোন উপায় হইল না। সুরেন্দ্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার জনকোলাহলপূর্ণ রাজপথে পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিল। এখানে তিরস্কার করিবারও কেহ নাই, দিবানিশি শাসনে রাখিতেও কেহ চাহে না। মুখ শুকাইলে কেহ ফিরিয়া দেখে না, মুখ ভারী হইলেও কেহ লক্ষ্য করে না। এখানে নিজেকে নিজে দেখিতে হয় । এখানে ভিক্ষাও জোটে, করুণারও স্থান আছে, আশ্রয়ও মিলে–কিন্তু আপনার চেষ্টা চাই; স্বেচ্ছায় কেহই তোমার মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না।

খাইবার চেষ্টা যে আপনাকে করিতে হয়, আশ্রয়ের স্থানটুকু যে নিজেকে খুঁজিয়া লইতে হয়, কিংবা, নিদ্রা এবং ক্ষুধার মাঝে যে একটু প্রভেদ আছে–এইখানে আসিয়া সে এইবার প্রথম শিক্ষা করিল।

কতদিন হইল, সে বাড়ি ছাড়িয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শরীরটাও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, অর্থও ফুরাইয়া আসিতেছে, বস্ত্রাদি মলিন এবং জীর্ণ হইতে চলিল, রাত্রে শুইয়া থাকিবার স্থানটুকুরও কোন ঠিকানা নাই–সুরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। বাটীতে পত্র লিখিতেও ইচ্ছা হয় না–বড় লজ্জা করে এবং সকলের উপর যখন তাহার বিমাতার সেই স্নেহ-কঠিন মুখখানি মনে পড়ে, তখন বাটি যাইবার ইচ্ছা একেবারে আকাশকুসুম হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে যে সে কখনও ছিল এ কথা ভাবিতেও তাহার ভয় হয়।

একদিন সে তাহারই মত একজন দরিদ্রকে কাছে পাইয়া বলিল, বাপু, তোমরা এখানে খাও কি করিয়া?

লোকটা একটু বোকা ধরনের–না হইলে উপহাস করিত। সে বলিল, চাকরি করিয়া খাটিয়া খাই। কলিকাতায় রোজগারের ভাবনা কি?

সুরেন্দ্র বলিল, আমাকে একটা চাকরি করিয়া দিতে পার?

সে কহিল, তূমি কি কাজ জান?

সুরেন্দ্রনাথ কোন কাজই জানিত না, তাই সে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

তুমি কি ভদ্রলোক? –সুরেন্দ্র মাথা নাড়িল।

তবে লেখাপড়া শেখনি

কেন?

শিখেছি।

সে লোকটা একটু ভাবিয়া বলিল, তবে ঐ বড়বাড়িতে যাও। ওখানে বড়লোক জমিদার থাকে–একটা কিছু কাজ করিয়া দিবেই। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ ফটকের কাছে আসিল। একবার দাঁড়াইল, আবার পিছাইয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিল–আবার ফিরিয়া গেল। সেদিন আর কিছু হইল না। পরদিনও ঐরূপ করিয়া কাটিল। দুই দিন ধরিয়া সে ফটকের নিকট উমেদারি করিয়া তৃতীয় দিবসে অপেক্ষাকৃত সাহস সঞ্চয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি চান?

বাবুকে–

বাবু বাড়ি নেই।

সুরেন্দ্রনাথের বুকখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল–একটা নিতান্ত শক্ত কাজের হাত হইতে সে পরিত্রাণ পাইল। বাবু বাড়ি নাই। চাকরির কথা, দুঃখের কাহিনী বলিতে হইল না, ইহাই তাহার আনন্দের কারণ। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরিয়া গিয়া, দোকানে বসিয়া পেট ভরিয়া খাবার খাইয়া খানিকক্ষণ সে মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইল, এবং মনে মনে রীতিমত আলোচনা করিতে লাগিল যে, পরদিন কেমন করিয়া কথাবার্তা কহিতে পারিলে তাহার নিশ্চিত একটা কিনারা হইয়া যাইবে।

পরদিন কিন্তু উৎসাহটা তেমন রহিল না। বাটীর যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে ফটকের নিকট আসিয়া একেবারে সে দমিয়া পড়িল–পা আর কোন মতেই ভিতরে যাইতে চাহে না। আজ তাহার কিছুতেই মনে হইতেছে না যে, সে নিজের কাজের জন্যই নিজে আসিয়াছে–ঠিক মনে হইতেছিল, যেন জোর করিয়া আর কেহ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দ্বারের কাছে সে আর উমেদারি করিবে না, তাই ভিতরে আসিল। সেই ভৃত্যটার সহিত দেখা হইল। সে বলিল, বাবু বাড়ি আছেন, দেখা করবেন কি?

হাঁ।

তবে চলুন।

এটা আরও কঠিন!

জমিদারবাবুর প্রকান্ড বাড়ি। রীতিমত সাহেবী ধরনের সাজান আসবাবপত্র। কক্ষের পর কক্ষ, মারবেল-প্রস্তরের সোপানাবলী, ঝাড়লণ্ঠন লাল কাপড়ে ঢাকা প্রতি কক্ষে শোভা পাইতেছে, ভিত্তি-সংলগ্ন প্রকান্ড মুকুর, কত ছবি, কত ফটোগ্রাফ। এ-সকল অপরের পক্ষে যাহাই হউক, সুরেন্দ্রের নিকট নূতন নহে। কারণ, তাহার পিতার বাটীও দরিদ্রের কুটীর নহে; আর যাহাই হউক, সে দরিদ্র পিতার আশ্রয়ে এত বড় হয় নাই। সুরেন্দ্র ভাবিতেছেল–সেই লোকটির কথা, যাহার সহিত দেখা করিতে, অনুনয়-বিনয় করিতে যাইতেছে,–তিনি কি প্রশ্ন করিবেন, এবং সে কি উত্তর দিবে।

কিন্তু এত ভাবিবার সময় নাই–কর্তা সম্মুখে বসিয়া ছিলেন; সুরেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলেন, কি প্রয়োজন?

আজ তিন দিন ধরিয়া সুরেন্দ্র এই কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু এখন সব ভুলিয়া গেল, বলিল, আমি–আমি–

ব্রজরাজ লাহিড়ী পূর্ববঙ্গের জমিদার। মাথায় দুই-চারিগাছা চুলও পাকিয়াছে–বাতিকে নহে, ঠিক বয়সেই পাকিয়াছিল। বড়লোক, অনেককে দেখিয়াছিলেন; তাই চট্ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে অনেকটা বুঝিয়া লইলেন, কহিলেন, হাঁ বাপু, কি চাও তুমি?

কোন একটা–

কি একটা?

চাকরি–

ব্রজরাজবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আমি চাকরি দিতে পারি এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?

পথে একজনের সহিত দেখা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে-ই আপনার কথা–

ভাল। তোমার বাড়ি কোথায়?

পশ্চিমে।

সেখানে কে আছে?–সুরেন্দ্রনাথ সব কথা বলিল।

তোমার পিতা কি করেন?

অবস্থাবৈগুণ্যে সুরেন্দ্র নূতন ধাঁচ শিখিয়াছিল–একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, সামান্য চাকরি করেন।

তাতে চলে না, তাই তুমি উপার্জন করিতে চাও?

হাঁ।

এখানে কোথায়

থাকো?

কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই–যেখানে সেখানে।

ব্রজবাবুর দয়া হইল । সুরেন্দ্রনাথকে কাছে বসাইয়া তিনি বলিলেন, তুমি এখনও বালক মাত্র। এই বয়সে বাড়ি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়া দু:খ

হইতেছে। আমি নিজে যদিও কোনও চাকরি দিতে পারি না, কিন্তু যাহাতে কিছু যোগাড় হয়, তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি।

আচ্ছা, বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, ব্রজবাবু তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, আর কিছু তোমার জিজ্ঞাসা করিবার নাই?

না।

ইহাতেই তোমার কাজ হইয়া গেল? কি উপায় করিতে পারি, কবে করিতে পারি,–কিছুই জানিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলে না?

সুরেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু সহাস্যে বলিলেন, এখন কোথায় যাইবে?

কোন একটা দোকানে।

সেইখানেই আহার করিবে?

প্রতিদিন তাহাই করি।

তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখিয়াছ?

কিছু শিখিয়াছি।

আমার ছেলেকে পড়াইতে পারিবে?

সুরেন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, পারিব।

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন। তাঁহার মনে হইল, দুঃখে এবং দারিদ্র্যে তাহার মাথার ঠিক নাই, কেননা, কাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে এবং কি শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথা না জানিয়াই অতটা আনন্দিত হওয়া তাঁহার নিকটে পাগলামি বলিয়া বোধ হইল। বলিলেন, যদি সে বলে, আমি বি. এ. ক্লাসে পড়ি, তখন তুমি কি করিয়া পড়াইবে?

সুরেন্দ্র একটু গম্ভীর হইয়া ভাবিয়া বলিল, তা একরকম হইবে–

ব্রজবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, বঙ্কু, এই বাবুটির থাকিবার জায়গা করিয়া দাও, এবং স্নানাহারের যোগাড় দেখ।–পরে সুরেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, সন্ধ্যার পর আবার ডাকাইয়া পাঠাইব। তুমি

আমার বাড়িতেই থাক। যতদিন কোন চাকরির উপায় না হয়, ততদিন স্বচ্ছন্দ্যে এখানে থাকিতে পারিবে।

দ্বিপ্রহরের আহার করিতে গিয়া তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধবীকে ডাকিয়া কহিলেন, মা, একজন দু:খী লোককে বাড়িতে স্থান দিয়াছি।

কে, বাবা?

দুঃখী লোক, এ ছাড়া আর কিছু জানি না। লেখাপড়া বোধ হয় কিছু জানে, কেননা, তোমার দাদাকে পড়াইবার কথা বলাতে, তাহাতেই সে স্বীকার করিয়াছিল। বি.এ. ক্লাসের ছেলেকে যে পড়াইতে সাহস করিতে পারে, অন্তত তোমার ছোট বোনটিকে সে নিশ্চয়ই পড়াইতে পারিবে। মনে, করিতেছি সে-ই প্রমীলার মাস্টার থাকুক।

মাধবী আপত্তি করিল না।

সন্ধ্যার পর তাহাকে ডাকিয়া আনাইয়া, ব্রজবাবু তাহাই বলিয়া দিলেন। পরদিন হইতে সুরেন্দ্রনাথ প্রমীলাকে পড়াইতে লাগিল।

প্রমীলার বয়স সাত বৎসর। সে বোধোদয় পড়ে। বড়দিদি মাধবীর নিকট ফার্স্ট বুকের ভেকের গল্প পর্যন্ত পড়িয়াছিল। সে খাতাপত্র বই, শ্লেট, পেন্সিল, ছবি, লজেঞ্জেস প্রভৃতি আনিয়া পড়িতে বসিল।

Do not move.– সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া দিল–Do not move–নড়িও না।

প্রমীলা পড়িতে লাগিল, Do not move–নড়িও না।

তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া শ্লেট টানিয়া লইল–পেন্সিল হাতে করিয়া আঁক পাড়িয়া বসিল। প্রব্লেমের পর প্রব্লেম সল্ভ হইতে লাগিল–ঘড়িতে সাতটার পর আটটা, তারপর নয়টা বাজিতে লাগিল। প্রমীলা কখনও এ-

পাশ কখনও ও-পাশ ফিরিয়া, ছবির পাতা উল্টাইয়া, শুইয়া বসিয়া লজেঞ্জেস মুখে পুরিয়া নিরীহ ভেকের সর্বাঙ্গে মসীলিপ্ত করিতে করিতে পড়িতে লাগিল, Do not move–নড়িও না।

মাস্টারমশাই, বাড়ি যাই?

যাও।

সকালবেলাটা তাহার এইরূপেই কাটে। কিন্তু, দুপুরবেলার কাজটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। চাকুরির যাহাতে

উপায় হয়, এজন্য ব্রজবাবু অনুগ্রহ করিয়া দু-একজন ভদ্রলোকের নামে খানকতক পত্র দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এইগুলি পকেটে করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সন্ধান করিয়া তাহাদের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখে, কত বড় বাড়ি, কয়টা জানালা,

বাহিরে কতগুলি ঘর, দ্বিতল কি ত্রিতল, সম্মুখে কোন ল্যাম্প-পোস্ট আছে কি না, তাহার পর সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসে।

কলিকাতায় আসিয়াই সে কতগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়াছিল, বাড়ি হইতেও কতগুলি লইয়া আসিয়াছিল। এখন সেইগুলি সে গ্যাসের আলোকে অধ্যয়ন করিতে থাকে। ব্রজবাবু কাজকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হয় চুপ করিয়া থাকে, নাহয় বলে, ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ চারি বৎসর হইল ব্রজরাজবাবুর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে–বুড়া বয়সের এ দুঃখ বুড়াতেই বোঝে। কিন্তু সে কথা যাক–তাঁহার আদরের কন্যা মাধবী দেবী যে এই তার ষোল বৎসর বয়সেই স্বামী হারাইয়াছে–ইহাই ব্রজরাজের শরীরের অর্ধেক রক্ত শুষিয়া লইয়াছে। সাধ করিয়া ঘটা করিয়া তিনি মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। নিজের অনেক টাকা,–তাই অর্থের প্রতি নজর দেন নাই, ছেলেটির বিষয়-আশয় আছে কি না, খোঁজ লন নাই, শুধু দেখিয়াছিলেন, ছেলেটি লেখাপড়া করিতেছে, রূপবান, সৎ, সাধুচরিত্র লক্ষ্য করিয়া মাধবীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

এগার বৎসর বয়সে মাধবীর বিবাহ হইয়াছিল। তিন বৎসর সে স্বামীব কাছে ছিল। যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা সবই সে পাইয়াছিল।

কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ বাঁচিলেন না। মাধবীর এ জীবনের সব সাধ মুছিয়া দিয়া, ব্রজরাজের বক্ষে শেল হানিয়া, তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মরিবার সময় মাধবী যখন বড় কাঁদিতে লাগিল, তখন তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিয়াছিলেন, মাধবী, তোমাকে যে ছাড়িয়া যাহিতেছি, এইটিই আমার সব চেয়ে দুঃখ। মরি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি যে আজীবন ক্লেশ পাইবে, এইটি আমাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। তোমাকে যে যত্ন করিতে পাইলাম না–

দরবিগলিত অশ্রুরাশি যোগেন্দ্রের শীর্ণবক্ষে ঝরিয়া পড়িল। মাধবী তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, আবার যখন তোমার পায়ে গিয়া পড়িব, তখন যত্ন করিও –

যোগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, মাধবী, যে জীবন তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, সেই জীবন সকলের সুখে সমর্পণ করিও। যার মুখ ক্লিষ্ট মলিন

দেখিবে তাহারই মুখ প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিও–আর কি বলিব, মাধবী–আবার উচ্ছ্বসিত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল–মাধবী তাহা মুছাইয়া দিল।

সৎপথে থাকিও–তোমার পুণ্যে আবার তোমাকে পাইব।

সেই অবধি মাধবী একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ

প্রভৃতি যাহা কিছু তাহার ছিল, স্বামীর চিতাভস্মের সহিত সবগুলি সে ইহজন্মের মত গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। এ জীবনের কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা! বিধবা হইলে কিছু সে-সব যায় না,–মাধবী তখন স্বামীর কথা ভাবে। তিনি যখন নাই, তখন আর কেন? কাহার জন্য পরের হিংসা করিব! কাহার জন্য পরের চোখে জল বহাইব! আর এ সকল হীন প্রবৃত্তি তাহার কোন কালেই ছিল না, বড়লোকের মেয়ে–কোন সাধ, কোন আকাঙ্ক্ষাই তাহার অতৃপ্ত ছিল না–হিংসা-দ্বেষ কোনদিন শিখেও নাই।

তাহার নিজের হৃদয়ে অনেক ফুল ফোটে, আগে সে ফুলে মালা গাঁথিয়া সে স্বামীর গলায় পরাইয়া দিত। এখন স্বামী নাই, তাই বলিয়া ফুলগাছটি সে কাটিয়া ফেলে নাই। এখনো তাহাতে তেমনি ফুল ফোটে, ভুমে লুটাইয়া পড়ে। এখন সে আর মালা গাঁথিতে যায় না সত্য, গুচ্ছ করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া দীন-দুঃখীকে তাহা বিলাইয়া দেয়। যাহার নাই, তাহাকেই দেয়, এতটুকু কার্পণ্য নাই, এতটুকু মুখ ভারী করা নাই।

ব্রজবাবুর গৃহিনী যেদিন পরলোকগমন করেন, সেই দিন হইতে এ সংসারে আর শৃঙ্খলা ছিল না। সবাই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত; কেহ কাহাকেও দেখিত না, কেহ কাহারও পানে চাহিত না। সকলেরই এক-একজন ভৃত্য মোতায়েন ছিল, তাহারা আপন আপন প্রভুর কাজ করিত। রন্ধনশালায় পাচক রন্ধন করিত, বৃহৎ অন্নসত্রের মত লোকে পাতপাড়িয়া বসিয়া খাইত। কেহ খাইতে পাইত, কেহ পাইত না। সে দুঃখ কেহ চাহিয়াও দেখিত না।

কিন্তু যেদিন হইতে মাধবী তাহার ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গার মত রূপ, স্নেহ, মমতা লইয়া পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিল, সেই দিন হইতে যেন সমস্ত সংসারে নবীন বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন সবাই কহে, ‘বড়দিদি’, সবাই বলে মাধবী। বাড়ির পোষা কুকুরটা পর্যন্ত দিনান্তে একবার ‘বড়দিদি’কে দেখিতে চাহে। এত লোকের মধ্যে সেও যেন একজনকে স্নেহময়ী সর্বময়ী বলিয়া বাছিয়া রাখিয়াছে। বাড়ির প্রভু হইতে সরকার,

গোমস্তা, দাস, দাসী সবাই ভাবে বড়দিদির কথা, সবাই তাহার উপর নির্ভর করে; সকলেরই মনে মনে একটা ধারণা যে, যে কারণেই হোক, এই বড়দিদিটির উপর তাহার একটু বিশেষ দাবি আছে।

স্বর্গের কল্পতরু কখনও দেখি নাই, দেখিব কি না তাহাও জানি না, সুতরাং তাহার কথা বলিতেও পারিলাম না। কিন্তু, এই ব্রজবাবুর সংসারবর্তী লোকগুলো একটি কল্পতরু পাইয়াছিল। তলায় গিয়া হাত পাতিত, আর হাসিমুখে ফিরিয়া আসিত।

এরূপ পরিবারের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ একটা নূতন ধরনের জীবন অতিবাহিত করিবার উপায় দেখিতে পাইল। সকলে যখন একজনেরই উপর সমস্ত ভার রাখিয়াছে, তখন সেও তাহাদের মতই করিতে লাগিল। কিন্তু, অপরের অপেক্ষা তাহার ধারণা একটু ভিন্ন প্রকারের। সে ভাবিত, ‘বড়দিদি’ বলিয়া একটি জীবন্ত পদার্থ বাটীর মধ্যে থাকে, সকলকে দেখে, সব আবদার সহ্য করে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহারই নিকট পাওয়া যায়। কলিকাতায় রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের জন্য নিজে ভাবিবার প্রয়োজনটা সে কতক বুঝিয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি সে একেবারে ভুলিয়া গেল যে, আপনার জন্য তাহাকে বিগত জীবনে কোন একটি দিনও ভাবিতে হইয়াছিল, বা পরে ভাবিতে হইবে।

জামা, কাপড়, জুতা, ছাতি, ছড়ি–যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই তাহার কক্ষে প্রচুর আছে। রুমালটি পর্যন্ত তাহার জন্য সযত্নে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়া

গিয়াছে। প্রথমে কৌতূহল হইত, সে জিজ্ঞাসা করিত, এ সব কোথা হইতে আসিল? উওর পাইত, বড়দিদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। জলখাবারের থালাটি পর্যন্ত দেখিলে সে আজকাল বুঝিতে পারে, ইহাতে বড়দিদির সযত্ন স্পর্শ ঘটিয়াছে।

অঙ্ক কষিতে বসিয়া একদিন তাহার কম্পাসের কথা মনে পড়িল; প্রমীলাকে কহিল, প্রমীলা! বড়দিদির কাছ থেকে কম্পাস নিয়ে এস।

কম্পাস লইয়া বড়দিদিকে কাজ করিতে হয় না, ইহা তাহার নিকট ছিল

না; কিন্তু বাজারে

তখনই সে লোক পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেখিল, তাহার টেবিলের উপর প্রার্থিত বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে। পরদিন সকালে প্রমীলা কহিল, মাস্টারমশাই, কাল দিদি ঐটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তাহার পর মধ্যে মধ্যে সে এমন এক-আধটা জিনিস চাহিয়া বসিত যে, মাধবী সেজন্য বিপদে পড়িয়া যাইত। অনেক অনুসন্ধান করিয়া তবে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইত। কিন্তু কখনও সে বলে নাই, দিতে পারিব না।

কিংবা কখনও সে হঠাৎ হয়ত প্রমীলাকে কহিল, বড়দিদির নিকট হইতে পাঁচখানা পুরাতন কাপড় লইয়া এস; ভিখারীদের দিতে হইবে। নূতন-পুরাতন বাছিবার অবসর মাধবীর সব সময় থাকিত না; সে আপনার পাঁচখানা কাপড় পাঠাইয়া দিয়া, উপরের গবাক্ষ হইতে দেখিত–চারি-পাঁচজন দুঃখী লোক কলরব করিতে করিতে ফিরিয়া যাইতেহে–তাহারাই বস্ত্রলাভ করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের এই ছোটখাটো আবেদন-অত্যাচার নিত্যই মাধবীকে সহ্য করিতে হইত। ক্রমশ এ সকল এরূপ অভ্যাস হইয়া গেল যে, মাধবীর আর মনে হইত না, একটা নূতন জীব তাহার সংসারে আসিয়া দৈনন্দিন কার্যকলাপের মাঝখানটিতে নূতন রকমের ছোটখাটো উপদ্রব তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। এই নূতন জীবটির জন্য মাধবীকে আজকাল খুবই সতর্ক থাকিতে হয়, বড় বেশি খোঁজ লইতে হয়। সে যদি সব জিনিস চাহিয়া

লইত, তাহা হইলেও মাধবীর অর্ধেক পরিশ্রম কমিয়া যাইত; সে যে নিজের কোন জিনিসই চাহে না–এইটিই বড় ভাবনার কথা। প্রথমে সে জানিতে পারে নাই যে, সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক। প্রাতঃকালে চা ঠান্ডা হইয়া যায়, সে হয়ত খায় না। জলখাবার হয়ত স্পর্শ করিতেও তাহার মনে থাকে না, হয়ত বা কুকুরের মুখে তুলিয়া দিয়া সে চলিয়া যায়। খাইতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনের সে কোন সম্মানই রাখে না, পাশে ঠেলিয়া

নিচে ফেলিয়া সরাইয়া রাখিয়া যায়; যেন কোন দ্রব্যই তাহার মনে ধরে না। ভৃত্যেরা আসিয়া কহে, মাস্টারবাবু পাগলা, কিছু দেখে না, কিছু জানে না–বই নিয়েই বসে আছে।

ব্রজবাবু মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, চাকরির কোনরূপ সুবিধা হইতেছে কি না। সুরেন্দ্র সে কথার ভাসা ভাসা উত্তর দেয়। মাধবী পিতার নিকট সেসব শুনিতে পায়, সে-ই কেবল বুঝিতে পারে যে, চাকরির জন্য মাস্টারবাবুর একতিল উদ্যোগ নাই, ইচ্ছাও নাই। যাহা আপাতত হইয়াছে, তাহাতেই সে পরম সন্তুষ্ট। বেলা দশটা বাজিলেই বড়দিদির নিকট হইতে স্নানাহারের তাগিদ আসে। ভাল করিয়া আহার না করিলে বড়দিদির হইয়া প্রমীলা অনুযোগ করিয়া যায়। অধিক রাত্রি পর্যন্ত বই লইয়া বসিয়া থাকিলে ভৃত্যেরা গ্যাসের চাবি বন্ধ করিয়া দেয়, বারণ করিলে শুনে না-বড়দিদির হুকুম।

একদিন মাধবী পিতার কাছে হাসিয়া বলিল, বাবা, প্রমীলা যেমন, তার মাস্টারও ঠিক তেমনি।

কেন মা?

দু’জনেই ছেলেমানুষ। প্রমীলা যেমন বোঝে না, তার কখন কি দরকার, কখন কি খাইতে হয়, কখন শুইতে হয়, কখন কি করা উচিত, তার মাস্টারও সেইরকম, নিজের কিছুই বোঝে না–অথচ, অসময়ে এমনি জিনিস চাহিয়া বসে যে, জ্ঞান হইলে তাহা আর কেহ চায় না।

ব্রজবাবু বুঝিতে পারিলেন না, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

মাধবী হাসিয়া বলিল, তোমার মেয়েটি বোঝে কখন তার কি দরকার?

তা বোঝে না?

অথচ, অসময়ে উৎপাত করে ত?

তা করে।

মাষ্টারবাবু তাই করে–

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, ছেলেটি বোধহয় একটু পাগল।

পাগল নয়। উনি বোধ হয় বড়লোকের ছেলে।

ব্রজবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া জানিলে?

মাধবী জানিত না, কিন্তু এমনি বুঝিত। সুরেন্দ্র যে নিজের একটি কাজও নিজে় করিতে পারে না, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, পরে করিয়া দিলে হয়, না করিয়া দিলে হয় না–এই অক্ষমতাই তাহাকে মাধবীর নিকটে ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইত–এটা তাহার পূর্বের অভ্যাস। বিশেষ এই নূতন ধরনের আহার-প্রণালীটা মাধবীকে আরো চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। কোন খাদ্যদ্রব্যই যে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেনা, কিছুই সে তৃপ্তিপূর্বক আহার করে না–কোনটির উপরই স্পৃহা নাই, এই বৃদ্ধের মত বৈরাগ্য, অথচ বালকের ন্যায় সরলতা, পাগলের মত উপেক্ষা,–খাইতে দিলে খায়, না দিলে খায় না–এ সকল তাহার নিকট বড় রহস্যময় বোধ হইত। একটা অজ্ঞাত করুণাচক্ষুও সেই জন্য এই অজ্ঞাত মাষ্টারবাবুর উপর পড়িয়াছিল। সে যে লজ্জা করিয়া চাহে না, তাহা নহে, তাহার প্রয়োজন হয় না, তাই সে চাহে না। যখন প্রয়োজন হয়, তখন কিন্তু আর সময়-অসময় থাকে না–একেবারে বড়দিদির নিকট আবেদন আসিয়া উপস্থিত হয়। মাধবী মুখ টিপিয়া হাসে, মনে হয়, এ লোকটি নিতান্ত বালকের মত সরল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনোরমা মাধবীর বাল্যকালের সখী, তাহাকে বহুদিন পত্র লেখা হয় নাই, উত্তর না পাইয়া সে বিষম চটিয়া গিয়াছিল। আজ দ্বিপ্রহরের পর একটু সময় করিয়া, মাধবী তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিল। এমন সময় প্রমীলা আসিয়া ডাকিল, বড়দিদি ! মাধবী মুখ তুলিয়া কহিল, কি?

মাষ্টারমশায়ের চশমা কোথায় হারিয়ে গেছে–একটা চশমা দাও। মাধবী হাসিয়া ফেলিল।

তোমার মাস্টারমশায়কে বল গে, আমি কি চশমার দোকান করি? প্রমীলা ছুটিয়া যাইতেছিল। মাধবী তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল,

কোথায় যাচ্ছিস?

বলতে।

তার চেয়ে সরকারমশায়কে ডেকে নিয়ে আয়।

প্রমীলা সরকারমশায়কে ডাকিয়া আনিলে, মাধবী বলিয়া দিল–মাষ্টারবাবু চশমা হারিয়েছেন, ভাল দেখে একটা কিনে দাও গে।

সরকার চলিয়া গেলে, সে মনোরমাকে পত্র লিখিল, শেষে লিখিয়া দিল–

প্রমীলার জন্য বাবা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন–তাহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোট ছেলে বলিলেও হয়। আমার বোধ হয়, ইহার পূর্বে সে কখনও বাটীর বাহিরে হয় নাই–সংসারের কিছুই জানে না। তাহাকে না দেখিলে, না তত্ত্ব লইলে তাহার একদন্ডও চলে না। আমার অর্ধেক সময় সে কাড়িয়া লইয়াছে,– তোমাদের পত্র লিখিব আর কখন? এখন যদি তোমার শীঘ্র আসা হয়, তাহা হইলে, এই অকর্মণ্য লোকটিকে দেখাইয়া দিব। এমন অকেজো, অন্যমনস্ক লোক, তুমি জন্মে দেখ নাই। খাইতে দিলে খায়, না দিলে চূপ করিয়া উপবাস করে।

হয়ত সমস্ত দিনের মধ্যেও তাহার মনেও পড়ে না যে, তাহার আহার হইয়াছে কি না! একদিনের জন্যও সে আপনাকে চালাইয়া লইতে পারে না। তাই ভাবি এমন লোক সংসারে বাহির হয় কেন? শুনিতে পাই, তাহার পিতামাতা আছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁদের পাথরের মত শক্ত প্রাণ। আমি ত বোধ হয়, এমন লোককে চক্ষের আড়াল করিতে

পারিতাম না!

মনোরমা তামাশা করিয়া উত্তর লিখিল–তোমার পত্রে অন্যান্য সংবাদের মধ্যে জানিতে পরিলাম যে, তূমি বাড়িতে একটি বাঁদর পুষিয়াছ, আর তুমি তার সীতাদেবী হইয়াছ। কিন্তু তবু একটু সাবধান করিয়া দিতেছি। ইতি–মনোরমা।

পত্র পড়িয়া মাধবীর মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে উত্তর লিখিল–তোমার পোড়া মুখ, তাই কাহাকে কি ঠাট্টা করিতে হয়, জান না।

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, প্রমীলা, তোমার মাস্টারমশায়ের চশমা কেমন হয়েছে?

প্রমীলা বলিল, বেশ।

কেমন করে জানলে?

মাস্টারমশায় সেই চশমা চোখে দিয়ে বেশ বই পড়েন–তাই জানলুম।

মাধবী কহিল, তিনি নিজে কিছু বলেন নি?

কিছু না।

একটি কথাও না? ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, কিছু না?

না কিছু না।

মাধবীর সদাপ্রফুল্ল মুখ যেন মুহূর্তের জন্য মলিন হইল; কিন্তু তখনি হাসিয়া কহিল, তোমার মাস্টারকে বলে দিয়ো, তিনি যেন আর হারিয়ে না ফেলেন।

আচ্ছা, বলে দেব।

দূর পাগ্‌লি, তা কি বলতে আছে! তিনি হয়ত কিছু মনে করবেন।

তবে কি বলব না?

না।

শিবচন্দ্র মাধবীর দাদা। মাধবী একদিন তাহাকে ধরিয়া বলিল, দাদা, প্রমীলার মাস্টার রাতদিন কি পড়ে জান?

শিবচন্দ্র বি.এ. ক্লাসে পড়ে। ক্ষুদ্র প্রমীলার শিক্ষক-শ্রেণীর লোকগুলো তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই নহে। উপেক্ষা করিয়া বলিল নাটক-নভেল পড়ে, আর কি পড়িবে?

মাধবীর বিশ্বাস হইল না। প্রমীলাকে দিয়া একখানা পুস্তক লুকাইয়া আনিয়া, তাহার দাদার হাতে দিয়া বলিল, নাটক-নভেল বলে ত বোধ হয় না!

শিবচন্দ্র আগাগোড়া কিছু বুঝিল না, শুধু এইটুকু

বুঝিল যে, ইহার একবিন্দুও তাহার জানা নাই এবং এখানি গণিতের পুস্তক।

ভগিনীর নিকট সম্মান হারাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কহিল, এটা অঙ্কের বই, ইস্কুলে নীচের ক্লাসে পড়া হয়। বিষণ্ণমুখে মাধবী প্রশ্ন করিল, কোন পাশের পড়া নয়? কলেজের বই নয়?

শুষ্ক হাসিয়া শিবচন্দ্র বলিল, না, কিছুই নয়।–কিন্তু সেইদিন হইতে শিবচন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক কখনও সুরেন্দ্রের সম্মুখে পড়িত না। মনে মনে ভয় ছিল, পাছে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, পাছে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং পিতার আদেশে তাহাকে প্রাতঃকালটা প্রমীলার সহিত এক সঙ্গে এই মাস্টারটার নিকট খাতা–পেন্সিল লইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

কিছুদিন পরে মাধবী পিতাকে কহিল, বাবা আমি দিনকতকের জন্য কাশী যাব।

ব্রজবাবু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন,–সে কি মা? তুমি কাশী গেলে এ সংসারে কি হইবে?

মাধবী হাসিয়া বলিল, আমি আবার তো আসিব, একেবারে যাইতেছি না ত।

মাধবী হাসিল। পিতার চক্ষে কিন্তু জল আসিতেছিল। মাধবী বুঝিতে পারিল, এরূপ কথা বলা অন্যায় হইতেছে। সামলাইয়া লইবার জন্য কহিল, শুধু দিনকতকের জন্য বেড়াইয়া আসিব।

তা যাও–কিন্তু মা, সংসার চলবে না।

আমি ছাড়া সংসার চলবে না?

চলবে না কেন মা, চলবে! হাল ভাঙ্গিয়া গেলে স্রোতের মুখে নৌকাখানা যেমন করে চলে–এও তেমনি চলবে।

কিন্তু, কাশী যাওয়া তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। সেখানে তাহার বিধবা ননদিনী একমাত্র পুত্র লইয়া বাস করেন,তাঁহাকে একবার দেখিতে হইবে।

কাশী যাইবার দিন সে প্রত্যেককে ডাকিয়া সংসারের ভার দিয়া গেল। বুড়ি দাসীকে ডাকিয়া, পিতা, দাদা ও প্রমীলাকে বিশেষরূপে দেখিবার জন্য অনুরোধ ও উপদেশ দিয়া দিল; কিন্তু মাস্টারের কথা কাহাকেও কহিল না। ভুলিয়া যায় নাই–ইচ্ছা করিয়াই বলিল না। সম্প্রতি

তাহার উপর একটু রাগ হইয়াছিল। মাধবী তাহার জন্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু এমন কি সে একটা মুখের কথাতেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই। তাই মাধবী বিদেশে গিয়া এই অকর্মণ্য সংসারানভিজ্ঞ উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে যে, সে একজন ছিল। একটা কৌতুক করিতে দোষ কি? সে না থাকিলে ইহার কেমনভাবে দিন কাটে, দেখিতে হানি কি? তাই সে সুরেন্দ্রের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না।

সুরেন্দ্রনাথ প্রব্লেম সল্ভ করিতেছিল। প্রমীলা কহিল, কাল রাত্রে দিদি কাশী গিয়াছেন।

কথাটা তাহার কানে গেল না। কিন্তু দিন দুই-তিন পরে যখন সে দেখিতে পাইল, দশটার সময় আহারের জন্য আর পীড়াপীড়ি হয় না–কোনদিন বা একটা-দুইটা বাজিয়া যায়। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িতে গিয়া দেখে বোধ হয় সেগুলি আর তেমনি পরিষ্কার নাই, জলখাবারের থালাটা তেমন সযত্ন-সজ্জিত নহে। রাত্রে গ্যাসের চাবি কেহ বন্ধ করিতে আসে না, পড়ার ঝোঁকে দুইটা-তিনটা বাজিয়া যায়। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় না, উঠিতে বেলা হয়, সমস্ত দিন চোখের পাতা ছাড়িয়া ঘুম কিছুতেই যাইতে চাহে না। শরীর যেন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন সুরেন্দ্রনাথের মনে হইল, এ সংসারে একটূ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গরম বোধ হইলে তবে লোকে পাখার সন্ধান করে। সুরেন্দ্রনাথ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, প্রমীলা, বড়দিদি এখানে নাই, না?

সে বলিল, দিদি কাশী গিয়াছেন।

তাইত!

দিনদুই পরে হঠাৎ প্রমীলার পানে চাহিয়া সে কহিল, বড়দিদি কবে আসবেন ?

একমাস পরে!

সুরেন্দ্রনাথ পুস্তকে মনোযোগ করিল। আরও পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ পেন্সিলটা পুস্তকের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, প্রমীলা, একমাসের আর কত বাকি?

অনেক দিন।

পেন্সিল তুলিয়া লইয়া সুরেন্দ্রনাথ চশমা খুলিয়া কাচ দুইটা পরিষ্কার করিল।

তাহার পর চক্ষে দিয়া পুস্তকের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন কহিল, প্রমীলা, বড়দিদিকে তুমি চিঠি লেখ না?

লিখি বৈ কি!

তাড়াতাড়ি আসতে লেখনি?

না।

সুরেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তাইত।

প্রমীলা বলিল, মাস্টারমশায়, বড়দিদি এলে বেশ হয়, না?

বেশ হয়।

আসতে লিখে দেব?

সুরেন্দ্রনাথ প্রফুল্ল হইয়া বলিল, দাও।

আপনার কথা লিখে দেব?

দাও।

'দাও' বলিতে তাহার কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইল না। কেননা, জগতের কোন আদব-কায়দা সে জানিত না। বড়দিদিকে আসিবার জন্য অনুরোধ করা যে তাহার মানায় না, ভাল শুনিতে হয় না, এটা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। যে না থাকিলে তাহার বড় ক্লেশ হয়, যাহার অবর্তমানে তাহার চলিতেছে না–তাহাকে আসিতে বলায় সে কিছুই অসঙ্গত মনে করিল না।

এ জগতে যাহার কৌতূহল কম, সে সাধারণ মনুষ্য-সমাজের একটু বাহিরে। যে দলে সাধারণ মনুষ্য বিচরণ করে, সে দলে তাহার মেলা চলে না। সাধারণের মতামত তাহার মতামতের সহিত মিশ খায় না। কৌতূহলী হওয়া সুরেন্দ্রের স্বভাব নহে। যতটা তাহার প্রয়োজন, ততটাই সে জানিতে চাহে, তাহার বাহিরে স্বেচ্ছাপূর্বক এক পদও যাইতে তাহার ইচ্ছা হইত না, সময়ও পাইত না। তাই বড়দিদির সম্বন্ধে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল। এতদিন এ সংসারে তাহার অতিবাহিত হইল, এই তিন মাস ধরিয়া সে বড়দিদির উপর ভর দিয়া পরম আরামে কাটাইয়া দিয়াছে; কিন্তু কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই, এই জীবটি কেমন।

কত বড়, কত বয়স, কেমন দেখিতে, কত গুণ, কিছুই সে জানিত না, জানিবার বাসনা হয় নাই, একবার মনেও পড়ে নাই। ইহার সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ত লোকের সাধ হয়!

সবাই কহে, বড়দিদি, সেও কহে, বড়দিদি। সবাই তাহার নিকট

স্নেহ-যত্ন পায়, সেও পায়। বিশ্বের ভাণ্ডার তাহার নিকট গচ্ছিত আছে, যে চাহে সে পায়–সুরেন্দ্রও লইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যের কথা আর কি? মেঘের কাজ–জল বরিষণ করা, বড়দিদির কাজ–স্নেহ-যত্ন করা। যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন যে হাত পাতে সে-ই জল পায়। বড়দিদির নিকট হাত পাতিলে অভীষ্ট-পদার্থ পাওয়া যায়। মেঘের মতই বুঝি সে অন্ধ, কামনা এবং আকাঙ্ক্ষাহীন। মোটের উপর সে এমনি একটা ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল । আসিয়া অবধি সে যে ধারণা গড়িয়া রাখিয়াছিল–আজও তাহাই আছে। শুধু এই কাশীগমন ঘটনাটির পর হইতে এইটুকু সে বেশি জানিয়াছে যে, বড়দিদি ভিন্ন তাহার একদণ্ডও চলিতে পারে না।

সে যখন বাড়িতে ছিল, তখন তাহার পিতাকে জানিত, বিমাতাকে জানিত। তাঁহাদের কর্তব্য কি তাহা বুঝিত, কিন্তু বড়দিদি বলিয়া কাহারও সহিত পরিচিত হয় নাই–যখন পরিচয় হইয়াছে, তখন সে এমনিই বুঝিয়াছে। কিন্তু মানুষটিকে সে চিনে না, জানে না, শুধু নামটি জানে, নামটি চেনে, লোকটি তাহার কেহ নহে। নামটি সর্বস্ব।

লোক যেমন ইষ্ট দেবতাকে দেখিতে পায় না, শুধু নামটি শিখিয়া রাখে, দুঃখে-কষ্টে সেই নামটির সম্মুখে সমস্ত হৃদয় মুক্ত করে, নতজানু হইয়া করুণাভিক্ষা চাহে,চক্ষে জল আসে,মুছিয়া ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে কাহাকে যেন দেখিতে চাহে–কিছুই দেখা যায় না; অস্পষ্ট জিহ্বা শুধু দুইটি কথা অস্ফুট উচ্চারণ করিয়া থামিয়া যায়। দুঃখ পাইয়া তাই সুরেন্দ্রনাথও অস্ফুটে উচ্চারণ করিল,’বড়দিদি’!

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখনও সূর্যোদয় হয় নাই, পূর্বদিক রঞ্জিত হইয়াছে মাত্র। প্রমীলা আসিয়া নিদ্রিত সুরেন্দ্রনাথের গলা জড়াইয়া ধরিল–মাস্টারমশায়! সুরেন্দ্রনাথের অলস চক্ষু দুটি ঈষৎ উন্মুক্ত হইল–কি প্রমীলা?

বড়দিদি এসেছেন। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বসিল। প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, চল, দেখে আসি।

এই দেখিবার বাসনাটি তাহার মনে কেমন করিয়া উদয় হইল বলা যায় না, এবং এতদিন পরে কেন যে সে প্রমীলার হাত ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিল, তাহাও বুঝিতে পারা গেল না; কিন্তু সে ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। মাধবীর কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রমীলা ডাকিল, বড়দিদি।

বড়দিদি অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা কাজ করিতেছিল, কহিল, কি দিদি!

মাস্টারমশাই—

দুইজনে ততক্ষণে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। মাধবী শশব্যস্ত দাঁড়াইয়া উঠিল; মাথার উপর এক হাত কাপড় টানিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্রনাথ কহিতেছিল, বড়দিদি, তোমার জন্য আমি বড় কষ্টে—মাধবী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বিষম লজ্জায় জিভ কাটিয়া মনে মনে বলিল, ছি-ছি!

তুমি চলে গেলে—

মাধবী মনে মনে বলিল, কি লজ্জা !

মাধবী মৃদুকণ্ঠে কহিল, প্রমীলা, মাস্টারমশায়কে বাহিরে যাইতে বল।

প্রমীলা ছোট হইলেও তাহার দিদির আচরণ দেখিয়া বুঝিতেছিল যে, কাজটা ঠিক হয় নাই। বলিল, চলুন মাস্টারমশাই—

অপ্রতিভের মত কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, চল। বেশি কথা সে কহিতে জানিত না, বেশি কথা বলিতে সে চায় নাই, তবে সারাদিন মেঘের পর সূর্য উঠিলে, হঠাৎ যেমন লোকে সেদিকে চাহিতে চায়, ক্ষণকালের জন্য যেমন মনে থাকে না যে সূর্যের পানে চাহিতে নাই, কিংবা চাহিলে চক্ষু পীড়িত হয়, তেমনি একমাস মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে থাকিয়া প্রথম সূর্যোদয়ের সহিত সুরেন্দ্রনাথ পরম আহ্লাদে চাহিয়া দেখিতে

গিয়েছিল, কিন্তু ফল যে এরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সে জানিত না।

সেইদিন হইতে তাহার যত্নটা একটু কমিয়া আসিল। মাধবী যেন একটু লজ্জা করিত। বিন্দু দাসী নাকি কথাটা লইয়া একটু হাসিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথও একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল । আজকাল সে যেন দেখিতে পায়, তাহার বড়দিদির অসীম ভান্ডার সসীম হইয়াছে। ভগিনীর যত্ন, জননীর স্নেহ-পরশ, যেন তাহার আর গায়ে লাগে না, একটু দূরে দূরে থাকিয়া সরিয়া যায়।

একদিন সে প্রমীলাকে কহিল, বড়দিদি আমার উপর রাগ করেছেন, না?

প্রমীলা বলিল, হাঁ।

কেন রে?

আপনি অমন করে বাড়ির ভিতর গিয়েছিলেন কেন?

যেতে নেই, না?

তা কি যেতে হয়? দিদি খুব রাগ করেছে।

সুরেন্দ্র পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া বলিল, তাইত–

তারপর একদিন দুপুরবেলা মেঘ করিয়া ঝড়-জল আসিল। ব্রজরাজবাবু আজ দুদিন হইল বাড়ি নাই; জমিদারি দেখিতে গিয়াছিলেন। মাধবীর হাতে কিছু কাজ ছিল না, প্রমীলাও বড় উপদ্রব করিতেছিল, মাধবী তাহাকে ধরিয়া কহিল, প্রমীলা, তোর বই নিয়ে আয়, দেখি কত পড়েছিস।

প্রমীলা একেবারে কাঠ হইয়া গেল। মাধবী বলিল, নিয়ে আয়।

বড়দিদি, রাত্তিরে আনব।

না, এখনি আন্। নিতান্ত দুঃখিত মনে তখন সে বই আনিতে গেল। আনিয়া বলিল, মাস্টারমশাই কিছুই পড়ায়নি–খালি আপনি পড়ে। মাধবী জিজ্ঞাসা করিতে বসিল। আগাগোড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিল যে, সত্যই মাস্টারমশাই কিছুই পড়ান নাই; অধিকন্তু সে যাহা শিখিয়াছিল, শিক্ষক নিযুক্ত করিবার পর, এই তিন-চারিমাস ধরিয়া বেশ ধীরে ধীরে সবটুকু ভুলিয়া গিয়াছে। মাধবী বিরক্ত হইয়া বিন্দুকে ডাকিয়া কহিল, বিন্দু, মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করে আয় ত, কেন প্রমীলাকে এতদিন একটুও পড়ান নি?

বিন্দু যখন জিজ্ঞাসা করিতে গেল, মাস্টার তখন প্রব্লেম

ভাবিতেছিল। বিন্দু কহিল, মাস্টারমশায়, বড়দিদি বলচেন যে,আপনি ছোটদিদিকে কিছু পড়ান নি কেন? মাস্টারমশায় শুনিতে পাইল না। এবার বিন্দু জোরে বলিল, মাস্টারমশায়?

কি?

বড়দিদি বলচেন–

কি বলচেন?

ছোটদিদিকে পড়ান নি কেন?

অন্যমনস্ক হইয়া সে জবাব দিল,–ভাল লাগে না।

বিন্দু ভাবিল, মন্দ নয়। একথা সে মাধবীকে জানাইল। মাধবীর রাগ হইল, সে নীচে আসিয়া দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া বিন্দুকে দিয়া বলাইল, ছোটদিদিকে একেবারে পড়ান নি কেন? কথাটা বার দুই-তিন জিজ্ঞাসা করিবার পরে, সুরেন্দ্রনাথ কহিল, আমি পারব না।

মাধবী ভাবিল, এ কেমন কথা!

বিন্দু বলিল, তবে আপনি কি জন্য আছেন?

না থাকলে কোথা যাব?

তবে পড়ান না কেন?

সুরেন্দ্রনাথের এবার চৈতন্য হইল! ফিরিয়া বসিয়া কহিল, কি বলচ?

বিন্দু এতক্ষণ ধরিয়া কি কহিতেছিল, তাহাই আবার আবৃত্তি করিল।

সুরেন্দ্রনাথ তখন কহিল, সে ত রোজ পড়ে!

পড়ে, কিন্তু আপনি দেখেন কি?

না। আমার সময় হয় না।

তবে এ বাড়িতে কেন আছেন?–সুরেন্দ্র চুপ করিয়া তাহা ভাবিতে লাগিল।

আপনি আর পড়াতে পারবেন না?

না। আমার পড়াতে ভাল লাগে না।

মাধবী ভিতর হইতে কহিল, জিজ্ঞাসা কর্ বিন্দু, কেন এতদিন তবে মিছা কথা বলে আসছেন? বিন্দু তাহাই কহিল। শুনিয়া সুরেন্দ্রের প্রব্লেমের জাল একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। একটু দুঃখিত হইল, একটু ভাবিয়া বলিল, তাইত, বড় ভুল হয়েছে।

এই চার মাস ধরে ক্রমাগত ভুল?

হ্যাঁ, তাইত হয়েছে দেখছি–তা কথাটা আমার তত মনে ছিল না।

পরদিন প্রমীলা পড়িতে আসিল না,

সুরেন্দ্রেরও তত মনে হইল না। তার পরদিনও আসিল না–সেদিনও অমনি গেল।

তৃতীয় দিবস প্রমীলাকে না দেখিতে পাইয়া সুরেন্দ্রনাথ একজন ভৃত্যকে কহিল, প্রমীলাকে ডেকে আন।

ভৃত্য ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ছোটদিদি আর আপনার কাছে পড়বেন না।

কার কাছে তবে পড়বে?

ভৃত্য বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল, অন্য মাস্টার আসবে।

বেলা তখন নয়টা বাজিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই-তিন খানা বই বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চশমাটা খাপে পুরিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ভৃত্য কহিল, মাস্টারবাবু, এ সময়ে কোথায় যাচ্ছেন?

বড়দিদিকে বলে দিও, আমি যাচ্ছি।

আর আসবেন না?

সুরেন্দ্রনাথ একথা শুনিতে পাইল না। বিনা উত্তরে ফটকের বাহিরে আসিয়া পড়িল। বেলা দুইটা বাজিয়া গেল, তথাপি সুরেন্দ্র ফিরিল না। ভৃত্য তখন মাধবীকে সংবাদ দিল যে, মাস্টারমহাশয় চলিয়া গিয়াছেন।

কোথায় গেছেন?

তা জানি না। বেলা নটার সময় চলে যান। যাবার সময় আমায় বলে যান যে, বড়দিদিকে বলো আমি চলে যাচ্ছি।

সে কিরে? না খেয়ে চলে গেলেন? মাধবী উদ্বিগ্ন হইল।

তারপর সে নিজে সুরেন্দ্রনাথের কক্ষে আসিয়া দেখিল–সব জিনিসপত্রই তেমনি আছে, টেবিলের উপর চশমাটি খাপেমোড়া রাখা আছে, শুধু বই কয়খানি নাই।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল–সুরেন্দ্রনাথ আসিল না। পরদিন মাধবী দুইজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিয়া দিল, তোমরা অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া আনিলে দশ টাকা পুরস্কার পাইবে। পুরস্কারের লোভে তাহারা ছুটিল; কিন্তু সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রমীলা কাঁদিয়া কহিল, বড়দিদি, তিনি চলে

গেলেন কেন?

মাধবী তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিল, বাইরে যা, কাঁদিস নে।

দুইদিন, তিনদিন করিয়া যতদিন যাইতে লাগিল, মাধবী তত অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। বিন্দু কহিল, বড়দিদি, তা এত খোঁজাখুঁজি কেন? কলকাতা শহরে আর কি মাস্টার পাওয়া যায় না?

মাধবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, তুই দূর হ! একটা মানুষ একটি পয়সা হাতে না নিয়ে চলে গেল, আর তুই বলিস খোঁজাখুঁজি কেন?

তার কাছে একটিও পয়সা নেই, তা কি করে জানলে ?

তা আমি জানি, কিন্তু তোর অত কথায় কাজ কি?

বিন্দু চুপ করিয়া গেল। ক্রমে যখন সাতদিন কাটিয়া গেল, অথচ কেহ ফিরিয়া আসিল না, তখন মাধবী একরূপ অন্নজল ত্যাগ করিল। তাহার মনে হইত, সুরেন্দ্রনাথ অনাহারে আছে। যে বাড়ির জিনিস চাহিয়া খাইতে পারে না, পরের কাছে কি সে চাহিতে পারে? তাহার দৃঢ় ধারণা সুরেন্দ্রনাথের কিনিয়া খাইবার পয়সা নাই, ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, ছোটছেলের মত অসহায় অবস্থায় হয়ত বা কোন ফুটপাতে বসিয়া কাঁদিতেছে, না হয় কোন গাছের তলায় বই মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া আছে।

ব্রজরাজবাবু ফিরিয়া আসিয়া সব কথা শুনিয়া মাধবীকে কহিলেন, কাজটা ভাল হয়নি মা। মাধবী কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল।

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। তিনদিন অনাহারে কাটিল, কলের জলে পয়সা লাগে না, তাই ক্ষুধা পাইলে পেট ভরিয়া জল খাইত।

একদিন রাত্রে অবসন্ন শরীরে সে কালীঘাটে যাইতেছিল, কোথায় নাকি শুনিয়াছিল, সেখানে খাইতে পাওয়া যায়। অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার মেঘ করিয়াছিল, চৌরঙ্গীর মোড়ে একখানা গাড়ি তাহার উপর আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ান কোনরূপে অশ্বের বেগ সংবরণ করিতে পারিয়াছিল। সুরেন্দ্র প্রাণে মরিল না বটে কিন্তু বক্ষে ও পার্শ্বে প্রচন্ড আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া

গেল। পুলিশ আসিয়া গাড়ি করিয়া হাসপাতালে লইয়া গেল। চার-পাঁচদিন অজ্ঞান অবস্থায় অতীত হইবার পর, রাত্রে চক্ষু চাহিয়া কহিল, বড়দিদি!

কলেজের একজন ছাত্র, যে সে-রাত্রে

ডিউটিতে ছিল, শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্র কহিল, বড়দিদি এসেছেন?

কাল সকালে আসবেন।

পরদিন সুরেন্দ্রের বেশ জ্ঞান হইল, কিন্তু বড়দিদির কথা কহিল না, প্রবল জ্বরে সমস্তদিন ছটফট করিয়া সন্ধ্যার সময় একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি হাসপাতালে আছি?

হ্যাঁ।

কেন?

আপনি গাড়িচাপা পড়েছিলেন।

বাঁচার আশা আছে?

নিশ্চয়।

পরদিন সেই ছাত্রটি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আত্মীয় কেহ এখানে আছেন?

কেহ না।

তবে সে-রাত্রে বড়দিদি বলে ডাকছিলেন কাকে? তিনি কি এখানে আছেন?

আছেন, কিন্তু তিনি আসতে পারবেন না। আমার পিতাকে সংবাদ দিতে পারেন?

পারি।

সুরেন্দ্রনাথ পিতার ঠিকানা বলিয়া দিল। সেই ছাত্রটি সেদিন পত্র লিখিয়া দিল। তাহার পর বড়দিদির সন্ধান লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল,—এখানে

স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে আসতে পারেন, আমরা সে বন্দোবস্ত করতে পারি। আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ঠিকানা জানতে পারলে তাঁকেও সংবাদ দিতে পারি।

সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ব্রজরাজবাবুর ঠিকানা কহিয়া দিল।

আমার বাসা ব্রজরাজবাবুর বাড়ির নিকটেই, আজ তাঁকে আপনার অবস্থা জানাব। যদি ইচ্ছা করেন, তিনি দেখতে আসতে পারেন।

সুরেন্দ্র কথা কহিল না। মনে মনে বুঝিল–বড়দিদির আসা অসম্ভব। ছাত্রটি কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া ব্রজবাবুকে সংবাদ দিল। ব্রজবাবু চমকিত হইলেন–বাঁচবে ত?

সম্পূর্ণ আশা আছে।

বাড়ির ভিতর গিয়া কন্যাকে কহিলেন, মাধবী, যা ভাবছিলাম তাই হয়েছে। সুরেন গাড়িচাপা পড়ে হাসপাতালে আছে।

মাধবীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

তোমার নাম করে নাকি বড়দিদি বলে ডাকছিল। তুমি দেখতে যাবে? এই সময় পার্শ্বের কক্ষে প্রমীলা ঝনঝন করিয়া কি-সব ফেলিয়া দিল। মাধবী সেইদিকে ছুটিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তুমি দেখে এসো, আমি যেতে পারব না।

ব্রজবাবু দুঃখিতভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সে বনের পশু, তার উপরে কি রাগ করে?

মাধবী কথা কহিল না। তবে ব্রজবাবু একাকী সুরেন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল, কহিলেন, সুরেন, তোমার পিতামাতাকে সংবাদ দিলে হয় না?

সংবাদ দিয়েছি।

কোন ভয় নেই, তাঁরা আসলেই একটা বন্দোবস্ত করে দেব।

ব্রজবাবু টাকাকড়ির জন্য চিন্তা করিয়া কহিলেন, বরং আমাকে তাঁদের ঠিকানা বলে দাও, যাতে তাঁদের এখানে আসার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তা করে দেব।

সুরেন্দ্র কথাটা তেমন বুঝিল না। বলিল, বাবা আসবেন, অসুবিধা আর কি আছে?

ব্রজবাবু বাড়ি ফিরিয়া মাধবীকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন।

সেই অবধি নিত্য তিনি একবার করিয়া সুরেন্দ্রকে দেখিতে যাইতেন। তাহার উপর একটা স্নেহ জন্মিয়াছিল। একদিন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মাধবী, তুমি ঠিক বুঝেছিলে, সুরেনের পিতা বেশ অর্থবান লোক।

মাধবী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন করে জানলে?

তার পিতা একজন বড় উকিল; কাল রাত্রে তিনি এসেছেন।

মাধবী মৌন হইয়া রহিল। তাহার পিতা কহিলেন, সুরেন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল।

কেন?

ব্রজরাজবাবু কহিলেন, তাহার পিতার সহিত আজ আলাপ হইল। তিনি সেকথা সমস্ত বলিলেন। এই বৎসর পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সম্মানের সহিত সুরেন এম. এ.পাশ করিলে বিলাত যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া তাঁহার পিতা সাহস করিয়া পাঠাইতে চাহেন নাই; তাই রাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। সে ভাল হইলে তিনি বাটী লইয়া যাইবেন।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংবরণ করিয়া লইয়া মাধবী বলিল, তাই ভাল।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছয় মাস হইল সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মাধবী একটিবার মাত্র মনোরমাকে পত্র লিখিয়াছিল , আর লেখে নাই ।

পূজার সময় মনোরমা পিতৃভবনে আসিয়া মাধবীকে ধরিয়া বসিল, তোর বাঁদর দেখা।

মাধবী হাসিয়া কহিল , বাঁদর কোথায় পাব লো?

মনোরমা তাহার চিবুকে হাত দিয়া সুর করিয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিল–

আমি এলাম ছুটে দেখব বলে,

কেমন শোভে পোড়ার বাঁদর–

তোমার ঐ রাঙ্গা চরণতলে।

সেই যে পুষেছিলি?

কবে?

মনোরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মনে নেই! যে তোকে বৈ আর জানত না?

মাধবী কথাটা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছিল, তাই অল্পে অল্পে মুখখানি বিবর্ণ হইতেছিল; তথাপি আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, ও– তাঁর কথা? তিনি আপনি চলে গেছেন।

অমন রাঙ্গা পা-দুটি তার পছন্দ হল না?

মাধবী মুখ ফিরাইল–কথা কহিল না। মনোরমা হাত দিয়া আদর করিয়া তাহার মুখ ফিরাইল–কৌতুক করিতে গিয়া দেখিল, তাহার দুই চক্ষে একরাশি জল আনিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য হইয়া কহিল, একি মাধবী!

মাধবী আর সামলাইতে পারিল না–চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মনোরমা বিস্ময়ের সীমা নাই–একটা উপযুক্ত কথাও সে খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ কাঁদিতে দিল। তাহার পর জোর করিয়া মুখ হইতে অঞ্চল খুলিয়া লইয়া নিতান্ত দুঃখিতভাবে বলিল, একটা সামান্য কৌতুক সইতে পারলে না বোন!

মাধবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যে বিধবা দিদি!

তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। দুইজনেই নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

মনোরমা কাঁদিতেছিল মাধবীর দুঃখে–সে বিধবা, তাই বলিয়া। কিন্তু মাধবীর অন্য কারণ ছিল। এখনি না জানিয়া মনোরমা যে ঠাট্টা করিয়াছে, যে তোকে বৈ আর জানত না–মাধবী তাহাই ভাবিতেছিল। এ কথা যে নিতান্ত সত্য, সে তাহা জানিত। অনেকক্ষণ পরে মনোরমা বলিল, কাজটা কিন্তু ভাল হয়নি।

কোন্ কাজটা?

তা কি বলে দিতে হবে বোন?–আমি সব বুঝেছি।

এই ছয় মাস ধরিয়া যে কথা মাধবী প্রাণপণে লুকাইয়া আসিতেছিল, মনোরমার কাছে আর তাহা লুকাইতে পারিল না। ধরা পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, বড় ছেলেমানুষের মত কাঁদিল।

শেষকালে মনোরমা বলিল, কিন্তু গেল কেন?

আমি যেতে বলেছিলাম।

বেশ করেছিলে–বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেছিলে।

মাধবী বুঝিল, মনোরমা কিছুই বোঝে নাই–তাই একে একে সব কথা বুঝাইয়া কহিল। তাহার পর বলিল, কিন্তু তিনি যদি না বাঁচতেন, তাহলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম। মনোরমা মনে মনে কহিল, –এখনি বা তার কম কি?

সেদিন বড় দুঃখিত হইয়া সে বাড়ি চলিয়া গেল। সেই রাত্রেই কাগজ-কলম লইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল–

তুমি ঠিক বলিতে–স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই। আমিও আজ তাহাই বলিতেছি, কেননা, মাধবী আমাকে শিখাইয়াছে। আমি তাহাকে বাল্যকাল হইতে জানি, তাই তাহাকে দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না, সাহস হয় না; সমস্ত স্ত্রীজাতিকে দোষ দিই–বিধাতাকে দোষ দিই–তিনি কি জন্য এত কোমল, এই জলের মত তরল পদার্থ দিয়া নারীর হৃদয় গড়িয়াছিলেন? এত ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া এ হৃদয় কে গড়িতে সাধিয়াছিল? তাঁহার চরণে প্রার্থনা, যেন এ হৃদয়গুলা একটু শক্ত করিয়া নির্মাণ করা হয়। আর তোমার চরণে প্রার্থনা, যেন ঐ পায়ে মাথা রাখিয়া ঐ মুখপানে চাহিয়া মরিতে পারি। মাধবীকে দেখিয়া বড় ভয় হয়,–সে আমার আজন্মের ধারণা ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। আমাকেও

বেশি বিশ্বাস করিও না–শীঘ্র আসিয়া লইয়া যাইও।

তাহার স্বামী উত্তর লিখিলেন–

যাহার রূপ আছে, সে দেখাইবেই। যাহার গুণ আছে, সে প্রকাশ করিবেই। যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, যে ভালবাসিতে জানে,–সে ভালবাসিবেই। মাধবীলতা রসাল বৃক্ষ অবলম্বন করে, ইহা জগতের রীতি–তুমি আমি কি করিতে পারি? তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি–সেজন্য চিন্তিত হইও না।

মনোরমা স্বামীর পত্র মাথায় রাখিয়া মনে মনে তাঁহার চরণ-উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লিখিল–মাধবী পোড়ামুখী–বিধবাকে যাহা করিতে নাই, সে তাই করিয়াছে। মনে মনে আর-একজনকে ভালবাসিয়াছে!

পত্র পাইয়া মনোরমার স্বামী মনে মনে হাসিলেন। তাহার পর কৌতুক করিয়া লিখিলেন,–মাধবী পোড়ামুখী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেননা, বিধবা হইয়া মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে। তোমাদের রাগ হইবার কথা–বিধবা হইয়া কেন সে তোমাদের সধবার অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমার কোন চিন্তা নাই, এমন সুবিধা কিছুতেই ছাড়িও

না। এই অবসরটুকুর মধ্যে পরম আরামে আর একজনকে মনে মনে ভালবাসিয়া লইও। কিন্তু কি জান মনোরমা, তুমি আমাকে আশ্চর্য করিতে পার নাই, আমি একবার একটা লতা দেখিয়াছিলাম, সেটা আধ-ক্রোশ ধরিয়া ভূমিতলে লতাইয়া লতাইয়া অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্পমঞ্জরী! তুমি যখন এখানে আসিবে, তখন দুইজনে সেটিকে দেখিয়া আসিব।

মনোরমা রাগ করিয়া তাহার উত্তর দিল না।

কিন্তু মাধবীর চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, প্রফুল্ল মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়াছে। কাজকর্মে তেমন বাঁধুনি নাই—একটু ঢিলা রকমের হইয়াছে। সকলকে যত্ন-আত্মীয়তা করিবার ইচ্ছা তেমনই আছে, বরং বাড়িয়াছে–কিন্তু সব কাজগুলা আর তেমন মনে থাকে না–মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যায়।

এখনো সবাই কহে,

'বড়দিদি', এখনো সবাই সেই কল্পতরুটির পানে চাহিয়া থাকে, হাত পাতে, অভীষ্ট ফল পায়; কিন্তু গাছ আর তেমন সরস সতেজ নাই। পুরাতন লোকগুলির মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়—পাছে শুকাইয়া যায়।

মনোরমা নিত্য আসে, অন্যান্য কথা হয়—শুধু একথা আর হয় না। মাধবী দুঃখিত হয়, মনোরমা তাহা বুঝিতে পারে। আর এ-সকল কথার আলোচনা যত না হয়, ততই ভাল। হতভাগী যদি ভুলিতে পারে, মনোরমা একথাও ভাবে।

সুরেন্দ্রনাথ আরাম হইয়া পিতার সহিত বাটী চলিয়া গিয়াছে। বিমাতা তাঁহার যত্নটা একটু কম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাই সুরেন্দ্র শরীরে একটু আরাম পাইয়াছে, কিন্তু শরীর বেশ সারিতে পারে নাই–অন্তরে একটু ব্যথা আছে। রূপ-যৌবনের আকাঙ্ক্ষা-পিপাসা এখনো তাহার মনে উদয় হয় নাই,–এসব সে জানিত না। পূর্বের মত এখনো সে অন্যমনস্ক, আত্মনির্ভরশূন্য। কিন্তু কাহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, এইটাই সে খুঁজিয়া পায় না। খুঁজিয়া পায় না বলিয়াই সেই

যে নিজের কাজ নিজে দেখিতে পারে, তাহাও নহে, আজও পরের পানে চাহিয়া থাকে, কিন্তু পূর্বের মত তেমন আর মনে ধরে না, সব কাজেই যেন একটু ত্রুটি দেখিতে পায়, একটু খুঁতখুঁত করে। তাহার বিমাতা দেখিয়া শুনিয়া কহেন, সুরো আজকাল বদলে গেছে।

মধ্যে একদিন তাহার জ্বর হইয়াছিল। বড় কষ্ট হইয়াছিল; চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বিমাতা কাছে বসিয়াছিলেন–তিনিও একটা নূতন জিনিস দেখিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁহারও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, আদর করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, সুরো, কেন বাবা? সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তারপর একখানা পোস্টকার্ড চাহিয়া লইয়া আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিয়া দিল–বড়দিদি, আমার জ্বর হইয়াছে, বড় কষ্ট হইতেছে।

পত্রখানা ডাকঘরে পৌঁছিল না। প্রথমে শয্যা হইতে মেঝের উপর পড়িল, তাহার পর যে ঘর ঝাঁটাইতে আসিল সে বেদানার খোসা, বিস্কুটের

টুকরা , আঙ্গুরের তুলা এবং সেই চিঠিখানি, সব একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল,–সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ধুলা মাখিয়া, হাওয়ায় উড়িয়া , শিশিরে ভিজিয়া, রোদ খাইয়া অবশেষে একটা বাবলা গাছের তলায় পড়িয়া রহিল।

প্রথমে সে একখানি মূর্তিমতী উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিল, তাহার পর একখানি হস্তাক্ষর–কিন্তু অনেকদিন কাটিয়া গেল, কিছুই আসিল না। ক্রমে তাহার জ্বর সারিয়া গেল –পথ্য করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর, তাহার জীবনে এক নূতন ঘটনা ঘটিল। ঘটনা যদিও নূতন, কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিক। সুরেন্দ্রের পিতা রায়মহাশয় ইহা বহূদিন হইতে জানিতেন এবং আশা করিতেন। সুরেন্দ্রের মাতামহ পাবনা জেলার একজন মধ্যবিত্ত জমিদার। কুড়ি-পঁচিশখানি গ্রামে জমিদারি; বাৎসরিক আয় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। একে তিনি অপুত্রক,খরচপত্র স্বভাবতঃ কম, তাহাতে তিনি

একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ ছিলেন। তাই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহূ অর্থ সঞ্চিত করিতে পারিয়াছিলেন । তাঁহার অবর্তমানে সমস্ত বৈভব একমাত্র দৌহিত্র সুরেন্দ্রনাথ পাইবে, রায়মহাশয় ইহা স্থির জানিতেন। তাহাই হইল। রায়মহাশয় সংবাদ পাইলেন, শ্বশুরমহাশয় আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি পুত্রকে লইয়া পাবনা যাত্রা করিলেন । কিন্তু পৌঁছাইবার পূর্বেই শ্বশুরমহাশয় পরলোকগমন করিলেন।

সমারোহ করিয়া শ্রাদ্ধ-শান্তি হইল। শৃঙ্খলিত জমিদারিতে আরো শৃঙ্খলার ঘটা পড়িয়া গেল। পরিপক্ক-বুদ্ধি প্রাচীন উকীল রায়মহাশয়ের কড়া বন্দোবস্তে,প্রজারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

এখন সুরেন্দ্রের বিবাহ হওয়া আবশ্যক। ঘটকের আনাগোনায় গ্রামময় আন্দোলন পড়িয়া গেল। পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে যে বাড়িতে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল, সেই বাড়িতেই ঘটকের দল ঘন ঘন পদধূলি দিয়া পিতামাতাকে আপ্যায়িত ও আশান্বিত করিতে লাগিল– এমনভাবে দুই মাস, ছয় মাস অতিবাহিত হইল।

অবশেষে বিমাতা আসিলেন, তাঁহার সর্ম্পকের যে কেহ ছিল, সেও আসিল–বন্ধু-বান্ধবে গৃহ পুরিয়া গেল।

তাহার পর, একদিন প্রভাতে, বাঁশি বাজাইয়া ঢাকের প্রচন্ড শব্দ করিয়া, কাঁসির খন্‌খন্‌ আওয়াজে সমস্ত গ্রাম পরিপূরিত করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়া আসিল।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রায়মহাশয়ও আর নাই, ব্রজরাজ লাহিড়ীও স্বর্গে গিয়াছেন। সুরেন্দ্রের বিমাতা স্বর্গীয় স্বামী-দত্ত সমস্ত সম্পত্তি টাকাকড়ি লইয়া পিতৃভবনে বাস করিতেছেন।

আজকাল সুরেন্দ্রনাথের যেমন সুখ্যাতি, তেমনি অখ্যাতি। একদল লোক কহে, এমন বন্ধুবৎসল, উদারচেতা, অমায়িক ইয়ার-প্রতিপালক জমিদার আর নাই। অন্যদল কহে, এমন উৎপীড়ক, অত্যাচারী জমিদার এ-তল্লাটে কখনও জন্মায় নাই।

আমরা জানি এ দুইটা কথাই সত্য। প্রথমটি সুরেন্দ্রনাথের জন্য সত্য, দ্বিতীয়টা তাঁহার ম্যানেজার মথুরনাথবাবুর জন্য সত্য।

সুরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় আজকাল খুব একদল ইয়ার বসিতেছে। তাহারা পরম সুখে সংসারের সাধ মিটাইয়া লইতেছে। পান-তামাক মদ-মাংস–কোন ভাবনা তাহাদিগকে করিতে হয় না। চাহিতেও হয় না–আপনি মুখে আসে।

ম্যানেজার মথুরবাবুর ইহাতে খুব উৎসাহ। খরচ যোগাইতে তিনি মুক্তহস্ত। কিন্তু এজন্য জমিদারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না; তাঁহার শাসনগুণে প্রজারা সে ব্যয় বহন করে। মথুরবাবুর নিকট একটি পয়সা বাকি-বকেয়া থাকিবার জো নাই। ঘর জ্বালাইতে, ভিটাছাড়া করিতে, কাছারিঘরের ক্ষুদ্র কুঠুরিতে আবদ্ধ করিতে তাঁহার সাহস এবং উৎসাহের সীমা নাই।

প্রজার আকুল ক্রন্দন মাঝে মাঝে শান্তি দেবীর কর্ণে প্রবেশ করে। সে স্বামীকে অনুযোগ করিয়া কহে, তুমি নিজে জমিদারি না দেখলে সব যে জ্বলে পুড়ে যায়।

সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গে–তাইত, তাইত, এসব কথা কি সত্য?

সত্য নয়? নিন্দায় যে দেশ ভরে গেল–তোমারই কানে কেবল এসব পৌঁছায় না। চব্বিশ ঘন্টা ইয়ার নিয়ে বসে থাকলে কি এসব কেউ শুনতে পায়? কাজ নেই অমন ম্যানেজারে, দূর করে তাড়িয়ে দাও।

সুরেন্দ্র দুঃখিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া

কহে, তাইত, কাল থেকে আমি নিজে সব দেখব। তাহার পর কিছুদিন জমিদারি দেখিবার তাড়া পড়িয়া যায়। মথুরনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠেন, গম্ভীরভাবে তখন কহেন, সুরেনবাবু, এমন করলে কি জমিদারি রাখতে পারবে?

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহে, দুঃখীর রক্ত শুষে এমন জমিদারিতে কাজ কি মথুরবাবু?

তবে আমাকে বিদায় দাও, আমি চলে যাই।

সুরেন্দ্রনাথ অমনি নরম হইয়া যায়। তাহার পর যাহা ছিল, তাহাই হয়। সুরেন্দ্রনাথ বৈঠকখানা হইতে আর বাহির হয় না।

সম্প্রতি আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। বাগানবাটী প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে নাকি এলোকেশী বলিয়া কে একটা মানুষ কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। নাচিতে-গাহিতে খুব মজবুত, দেখিতে-শুনিতেও মন্দ নয়। ভগ্ন-মধুচক্র মৌমাছির মত বৈঠকখানা ছাড়িয়া ঝাঁক বাঁধিয়া ইয়ারের দল সেই দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ রাখিবার স্থান নাই; সুরেন্দ্রনাথকেও তাহারা সেইদিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

আজ তিনদিন হইল–শান্তির স্বামিদর্শন ঘটে নাই। চার দিনের দিন সে স্বামীকে পাইয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, এতদিন ছিলে কোথায়?

বাগানবাড়িতে।

সেখানে কে আছে যে, তিনদিন ধরে পড়েছিলে?

তাইত–

সব কথায় তাইত! আমি সমস্ত শুনেছি–বলিতে বলিতে শান্তি কাঁদিয়া কহিল–আমি কি দোষ করেছি যে, আমাকে পায়ে ঠেলছ?

কৈ তা ত আমি–

আবার কি করে পায়ে ঠেলতে হয়? এর চেয়ে অপমান আমাদের আর কি আছে?

তাইত–তা ওরা সব–

শান্তি যেন সে কথা শুনিতে পাইল না। আরও কাঁদিয়া কহিল, তুমি স্বামী, আমার দেবতা! আমার ইহকাল! আমার পরকাল! আমি কি তোমাকে চিনিনে! আমি ত জানি, আমি তোমার কেউ নই, একদিনের জন্যও তোমার মন পাই না। এ যাতনা তোমাকে বলব কি! পাছে তুমি

লজ্জা পাও, পাছে তোমার ক্লেশ হয়, তাই কোন কথা বলি না।

শান্তি, কেন কাঁদ?

কেন কাঁদি! অন্তর্যামী জানেন। তাও বুঝতে পারি যে তুমি অযত্ন কর না–তোমারও মনে ক্লেশ আছে–তুমি আর কি করবে? তাহার পর চক্ষু মুছিয়া বলিল, আমি আজীবন যাতনা পাই, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি কষ্ট যদি জানতে পারি–

সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া স্বহস্তে তাহার চক্ষু মুছিয়া সস্নেহে কহিল, তা হলে কি কর, শান্তি?

এ কথার কি আর উত্তর আছে? শান্তি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে শান্তি কহিল, তোমার শরীরও আজকাল ভাল নেই।

আজ কেন, পাঁচ বছর থেকে নেই। যেদিন কলকাতায় গাড়িচাপা পড়েছিলাম, বুকেপিঠে আঘাত পেয়ে একমাস শয্যায় পড়েছিলাম, সে অবধি শরীর ভাল নেই। সে ব্যথা কিছুতেই গেল না, মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য হই, কেমন করে বেঁচে আছি।

শান্তি তাড়াতাড়ি স্বামীর বুকে হাত দিয়া বলিল, চল, দেশ ছেড়ে আমরা কলকাতায় যাই, সেখানে ভাল ডাক্তার আছে–

সুরেন্দ্র সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল–তাই চল। সেখানে বড়দিদিও আছেন।

শান্তি বলিল, তোমার বড়দিদিকে আমারও বড় দেখতে ইচ্ছে করে, তাঁকে আনবে ত?

আনব বৈ কি! তাহার পর ঈষৎ ভাবিয়া বলিল, নিশ্চয় আসবেন, আমি মরে যাচ্ছি শুনলে–

শান্তি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল–তোমার পায়ে পড়ি, আর ওসব বলো না।

আহা, তিনি যদি আসেন ত আমার কোনো দুঃখই থাকে না।

অভিমানে শান্তির বুক পুড়িয়া গেল। এইমাত্র সে বলিয়াছিল, স্বামীর সে কেহ নহে। সুরেন্দ্র কিন্তু অত বুঝিল না। অত দেখিল না, যাহা বলিতেছিল, তাহাতে বড় আনন্দ হয়, কহিল, তুমি নিজে গিয়ে বড়দিদিকে ডেকে এনো, কেমন? শান্তি মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল।

তিনি এলে দেখতে পাবে,

আমার কোন কষ্ট থাকবে না।

শান্তির চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

পরদিন সে দাসীকে দিয়া মথুরবাবুকে সংবাদ প্রেরণ করিল যে, বাগানবাটীতে যাহাকে আনা হইয়াছে, এখনি তাহাকে তাড়াইয়া না দিলে, তাহাকে আর ম্যানেজারের কাজ করিতে হইবে না। স্বামীকে শাসাইয়া বলিল, আর যাই হোক, তুমি বাড়ির বার হলে আমি মাথাখুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।

তাইত, ওঁরা কিন্তু–

আমি 'কিন্তু'র ব্যবস্থা করছি। বলিয়া শান্তি দাসীকে পুনর্বার ডাকিয়া হুকুম দিয়া দিল–দারোয়ানকে বলে দে, যেন ঐ হতভাগারা আমার বাড়িতে না ঢুকতে পায়!

আর সুবিধা নাই দেখিয়া মথুরবাবু এলোকেশীকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইয়ারদলও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি চুটাইয়া জমিদারি দেখিতে মন দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের সম্প্রতি কলিকাতায় যাওয়া হইল না, বুকের ব্যথাটা আপাততঃ কিছু কম বোধ হইতেছে। শান্তিরও কলিকাতা যাইতে তেমন উৎসাহ নাই। এখানে থাকিয়া যতখানি সম্ভব, সে স্বামীসেবার আয়োজন করিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে একজন বিজ্ঞ ডাক্তার আনাইয়া দেখাইল। বিজ্ঞ চিকিৎসক সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, বক্ষের অবস্থা যেমন আছে, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক কোনরূপ পরিশ্রমই সঙ্গত নহে।

অবসর বুঝিয়া ম্যানেজারবাবু যেরূপ কাজ দেখিতেছিলেন, তাহাতে গ্রামে গ্রামে দ্বিগুণ হাহাকার উঠিল। শান্তি মাঝে মাঝে শুনিতে পাইত, কিন্তু স্বামীকে জানাইতে সাহস করিত না।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার বাটীতে ব্রজবাবুর স্থানে শিবচন্দ্র এখন কর্তা। মাধবীর পরিবর্তে নূতন বধূ এখন গৃহিণী। মাধবী এখনও এখানে আছে। তাই শিবচন্দ্র স্নেহ-যত্ন করে, কিন্তু মাধবীর এখানে থাকিতে মন নাই। বাড়ির দাস-দাসী, সরকার-গোমস্তা এখনো 'বড়দিদি' বলে, কিন্তু সবাই বুঝে যে, আর একজনের হাতে এখন সিন্দুকের চাবি পড়িয়াছে। তাই বলিয়া শিবচন্দ্রের স্ত্রী যে মাধবীকে অবজ্ঞা বা অমর্যাদা করে তাহা নহে, কিন্তু সে এমন ভাবটি দেখাইয়া যায়, যাহাতে মাধবী বেশ বুঝিতে পারে যে, এই নূতন স্ত্রীলোকটির অনুমতি পরামর্শ ব্যতীত সব কাজ করা এখন আর তাহার মানায় না।

তখন বাপের আমল ছিল, এখন ভাইয়ের আমল হইয়াছে। কাজেই একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে। আগে আদর ছিল, আবদার ছিল–এখন আদর আছে, কিন্তু আবদার নাই। বাপের আদরে সে সর্বময়ী ছিল, এখন 'আত্মীয়-কুটুম্বের' দলে পড়িয়াছে।

এখন যদি কেহ বলেন যে, আমি শিবচন্দ্র কিংবা তাহার স্ত্রীর দোষ দিতেছি, সোজা করিয়া না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিন্দা করিতেছি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। সংসারে যাহা নিয়ম, যে রীতি-নীতি আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, আমি তাহারি উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। মাধবীর যেন কপাল পুড়িয়াছে, তাহার আপনার বলিবার স্থান নাই, তাই বলিয়া অপরে নিজের দখল ছাড়িবে কেন? স্বামীর দ্রব্যে স্ত্রীর অধিকার, একথা কে না জানে? শিবচন্দ্রের স্ত্রী কি শুধু এ কথা বুঝে না? শিবচন্দ্র নাহয় মাধবীর ভ্রাতা, কিন্তু সে মাধবীর কে? পরের জন্য সে নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিবে কেন? মাধবী সব বুঝিতে পারে। বৌ যখন ছোট ছিল, তখন ব্রজবাবু বাঁচিয়া ছিলেন, তখন মাধবীর নিকট প্রমীলাতে

ও তাহাতে প্রভেদ ছিল না। এখন কথার অনৈক্য হয়। সে চিরদিন অভিমানিনী, তাই সে

সকলের নীচে। কথা সহিবার ক্ষমতা নাই, তাই সে কথা সহে না। যেখানে তার জোর নাই সেখানে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যায়। মনে দুঃখ পাইলে নীরবে সহিয়া যায়, –শিবচন্দ্রকে কিছুই বলে না। স্নেহের দোহাই দেওয়া তাহার অভ্যাসের বাহিরে, তাই আত্মীয়তার ধুয়া ধরিয়া অধিকার কায়েম করিতে, তাহার সমস্ত শরীরে মনে ধিক্কার উঠে। সামান্য স্ত্রীলোকের মত ঝগড়া-কলহে তাহার যে কত ঘৃণা তাহা শুধু সে-ই জানে।

একদিন শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল, দাদা, আমি শ্বশুরবাড়ি যাব। শিবচন্দ্র বিস্মিত হইল।—সে কি মাধবী, সেখানে ত কেউ নেই!

মাধবী মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ছোট ভাগ্নে কাশীতে ঠাকুরঝির কাছে আছে, তাকে'নিয়ে আমি গোলাগাঁয়ে বেশ থাকব।

পাবনা জেলার গোলাগাঁয়ে মাধবীর শ্বশুরবাড়ি। শিবচন্দ্র অল্প হাসিয়া বলিল, তা কি হয়, সেখানে যে তোর বড় কষ্ট হবে।

কেন কষ্ট হবে দাদা? বাড়িটা এখনো পড়ে যায়নি। দু'বিঘা দশ বিঘা জমি-জিরাতও আছে, একটি বিধবার কি তাতে চলে না?

চলার কথা নয়। টাকার ভাবনা নেই, কিন্তু তোর যে বড় কষ্ট হবে মাধবী!

কষ্ট কিছুই নয়।

শিবচন্দ্র কিছু ভাবিয়া বলিল, কেন যাবি বোন? আমাকে সব খুলে বল দেখি, আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।–ইতিপূর্বে শিবচন্দ্র বোধ হয় স্ত্রীর নিকট ভগিনীর বিরুদ্ধে কিছু শুনিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ তাহাই মনে হইয়াছিল। লজ্জায় মাধবীর সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে বলিল, দাদা, তুমি কি মনে কর, আমি ঝগড়া করে তোমার বাড়ি থেকে যাব?

শিবচন্দ্র বড় লজ্জিত হইল। তাড়াতাড়ি কহিল, না না, তা নয়। আমি ও-কথা বলিনে, কিন্তু এ বাড়ি চিরদিনই তোমার, আজ কেন তবে চলে যেতে চাও?

যুগপৎ দুই জনেরই সেই স্নেহময় পিতার কথা মনে পড়িল। দুই জনের চক্ষেই জল দেখা দিল। চোখ মুছিয়া মাধবী বলিল,

আবার আসব। তোমার ছেলের যখন পৈতা হবে, তখন নিয়ে এস। এখন যাই!

সে ত আট-দশ বছরের কথা।

যদি বেঁচে থাকি, তা হলে আসব।

কোনরূপেই মাধবী এখানে থাকিতে সম্মত হইল না, যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নূতনবৌকে সংসার বুঝাইয়া দিল, দাস-দাসীকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিল। শেষ দিনটিতে শিবচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ-চক্ষে ভগিনীর কাছে আসিয়া বলিল, মাধবী, তোর দাদা কখনো ত তোকে কিছু বলেনি?

মাধবী হাসিল, বলিল–সে কি কথা দাদা?

তা নয়; যদি কোন অশুভক্ষণে, যদি কোনদিন মুখ থেকে অসাবধানে কিছু–

না দাদা, সে সব কিছু নয়।

সত্যি কথা?

সত্যি!

তবে যা। তোর নিজের বাড়ি যেতে আর মানা করব না। যেখানে ভাল লাগে–। তবে সর্বদা সংবাদ দিতে ভুলিস নি।

প্রথমে মাধবী কাশী গিয়া ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইল, তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া গোলাগাঁয়ে আসিয়া এই দীর্ঘ সাত বৎসর পরে স্বামী-ভবনে প্রবেশ করিল।

তখন গোলাগাঁয়ে চাটুয্যে মহাশয়ের বড় বিপদ ঘটিল। তিনি এবং যোগেন্দ্রের পিতা উভয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। তাই মৃত্যুকালে যোগেন্দ্র যে কয় বিঘা জমি-জায়দাদ ছিল, তাঁহারই হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের জীবিতকালে, তিনি যে সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন, যোগেন্দ্র সে সকলের বিশেষ কোন সংবাদও লইত না। শ্বশুরমহাশয়ের অনেক টাকা, তাই এই ক্ষুদ্র পিতৃ-দত্ত বিষয়টুকু তাহার যত্নের বাহিরে ছিল। তাহার পর সে মরিবার পর চাটুয্যে মহাশয় ন্যায্য অধিকারে বিনা বাধায় সে-সকল ভোগদখল করিতেছিলেন। এখন বিধবা মাধবী এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সুশৃঙ্খল নিয়মবদ্ধ পাতা সংসারে গোলমাল বাধাইয়া দিল। সুতরাং, চাটুয্যে মহাশয়ের ইহা অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে হইল, এবং মাধবী যে হিংসা করিয়াই

এমনটি করিয়াছে, তাহাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, তাইত বৌমা, তোমার দু' বিঘা যে জমি আছে, তার দশ বৎসরের খাজনা মায় সুদসুদ্ধ একশত টাকা বাকি আছে, সেটা না দিলে জমি নিলাম হবার মত হয়েচে। মাধবী ভাগিনেয় সন্তোষকুমারকে দিয়া বলাইল যে, টাকার জন্য চিন্তা নাই এবং অবিলম্বে একশত টাকা বাহিরে পাঠাইয়া দিল। অবশ্য এ টাকা চাটুয্যে মহাশয়ের অন্য কাজে লাগিল।

মাধবী কিন্তু অত সহজে ছাড়িবার লোক নহে, সে সন্তোষকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, শুধু দুই বিঘা জমির উপর নির্ভর করিয়া তাহার স্বর্গীয় শ্বশুরমহাশয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত না, সুতরাং বাকি যেসব জমি-জায়গা আছে, তাহা কোথায় এবং কাহার নিকট আছে?

চাটুয্যে মহাশয় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং আসিয়া বলিলেন যে, তাহা সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিছু বা বন্দোবস্তে আছে। এই আট-দশ বছর ধরিয়া জমিদারের খাজনা না দিলে জমি-জায়গা কিরূপে থাকা সম্ভব?

মাধবী কহিল, জমির কিছু কি উপস্বত্ব হইত না যে, এই কয়টা টাকা খাজনা দেওয়া হয় নাই? আর যদি যথার্থই বিক্রয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কে বিক্রয় করিয়াছে, এবং এখন কাহার নিকট আছে, সংবাদ পাইলে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা যায়। কাগজপত্রই বা কোথায়? চাটুয্যে মহাশয় অবশ্য কিছু জবাব দিয়াছিলেন কিন্তু মাধবী তাহা বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ বিড়বিড় করিয়া কত কি বকিলেন, তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া, নামাবলি কোমরে জড়াইয়া একখানা থান কাপড় গামছায় বাঁধিয়া লইয়া জমিদারবাবুর কাছারি লাল্‌তা-গাঁ অভিমুখে রওনা হইলেন। এই লালতা-গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের বাটী, এবং ম্যানেজার

মথুরবাবুর কাছারি। ব্রাহ্মণ আট-দশ ক্রোশ বরাবর হাঁটিয়া একেবারে মথুরবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিয়া পড়িলেন–দোহাই বাবা, গরীব ব্রাহ্মণকে বুঝি পথে

পথে ভিক্ষে করে খেতে হয়।

এমন ত অনেকে আসে! মথুরবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, হয়েছে কি?

বাবা, রক্ষে কর।

কি হয়েছে তোমার?

বিধু চাটুয্যে তখন মাধবী-দত্ত একশত টাকা দক্ষিণা হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি ধর্মাবতার, আপনি না রক্ষা করলে আমার সর্বস্ব যায়!

আচ্ছা, খুলে বল।

গোলাগাঁয়ের রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূ কোথা থেকে এতদিন পরে ফিরে এসে, আমার সমস্ত দখল করতে চায়।

মথুরবাবু হাসিলেন–সে তোমার সমস্ত দখল করতে চায়, না, তুমি তার সর্বস্ব দখল করতে চাও–কোন্‌টা?

ব্রাহ্মন তখন হাতে পৈতা জড়াইয়া ম্যানেজারের হাত চাপিয়া ধরিলেন–আমি যে এই দশ বছর থেকে সরকারের খাজনা যুগিয়ে আসচি?

জমি ভোগ করচ, খাজনা দেবে না?

দোহাই আপনার–

ভাবটা মথুরবাবু বেশ বুঝিলেন–বিধবাকে ফাঁকি দিতে চাও ত? ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

কয় বিঘা জমি?

পঁচিশ বিঘা।

মথুরবাবু হিসাব করিয়া বলিলেন, অন্ততঃ তিন হাজার টাকা। জমিদার কাছারিতে কি সেলামি দেবে?

যা হুকুম হবে তাই,–তিন শ' টাকা।

তিন শ' টাকা দিয়ে তিন হাজার টাকা নেবে? আমার দ্বারা কিছু হবে না।

ব্রাহ্মণ শুষ্কচক্ষে জল বাহির করিয়া বলিল, কত টাকা হুকুম হয়?

এক হাজার দিতে পারবে?

তাহার পর গোপনে বহুক্ষণ ধরিয়া দু'জনে পরামর্শ হইল, ফল এই দাঁড়াইল যে, যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রতি বাকি খাজনা বাবদ দশ বৎসরের সুদে-আসলে দেড়সহস্র টাকার নালিশ হইল। শমন বাহির হইল। কিন্তু মাধবীর নিকটে তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর এক তরফা ডিক্রি হইয়া গেল, এবং দেড়-মাস পরে মাধবী সংবাদ পাইল যে

বাকি খাজনার দায়ে জমিদার সরকার হইতে তাহার মায় বাটীসুদ্ধ নিলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে।

মাধবী একজন প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া কহিল, তোমাদের দেশ কি মগের মুল্লুক?

কেন বল দেখি?

তা নয় ত কি? একজন ঠকিয়ে আমার সর্বস্ব নিতে চায়, তোমরা দেখচ না?

সে বলিল, আমরা আর কি করব? জমিদার যদি নিলাম করে, আমরা দুঃখী লোক তাতে কি করতে পারি?

তা যেন হল, কিন্তু আমার বাড়ি নিলাম হবে, আর আমাকে সংবাদ নেই? কেমন তোমাদের জমিদার?

সে তখন সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল, এমন উৎপীড়ক জমিদার, এমন অত্যাচার, এ দেশে কেহ কখনও পূর্বে দেখে নাই। সে আরও কত কি কহিল। এ যাবৎ যাহা কিছু লোকপরম্পরায় অবগত ছিল, সমস্ত একে একে খুলিয়া বলিলে, মাধবী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবুর সঙ্গে নিজে দেখা করলে হয় না? ভাগিনেয় সন্তোষকুমারের জন্য মাধবী তাহাও করিতে স্বীকৃত ছিল।

সে তখন কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু কথা দিয়া গেল যে, কাল তাহার বোনপোর নিকট সব কথা ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়া বলিবে। তাহার বোনপো দুই-তিনবার লাল্‌তা-গ্রামে গিয়াছিল, জমিদার সরকারের অনেক কথা সে জানিত। এমন কি, সেদিন সে বাগানবাড়িতে এলোকেশীর সংবাদ পর্যন্ত শুনিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর মাসিমাতা যখন জমিদারবাবুর সহিত রামতনুবাবুর বিধবা পুত্রবধূর দেখা করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, তখন সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল, এই বিধবা পুত্রবধূটির বয়স কত?

মাসিমাতা বলিল, কুড়ি-একুশ হবে।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, দেখতে কেমন?

মাসিমাতা কহিল, পরীর মত।

তখন সে মুখভঙ্গী-সহকারে কহিল, দেখা করলে কাজ হতে পারে; কিন্তু আমি বলি, তিনি আজ রাত্রেই নৌকা

ভাড়া করে বাপের বাড়ি প্রস্থান করুন।

কেন রে ?

এই যে বলচ– সে দেখতে পরীর মত।

কেন, তাতে কি?

তাতেই সব। দেখতে পরীর মত হলে জমিদার সুরেন রায়ের কাছে রক্ষে নেই।

মাসিমাতা গালে হাত দিলেন,–বলিস কি, এমন!

বোনপো মৃদু হাসিয়া কহিল, হাঁ, এমন। দেশসুদ্ধ লোক এ কথা জানে।

তবে ত দেখা করা উচিত নয়?

কিছুতেই নয়।

কিন্তু বিষয়-আশয় যে সব যাবে!

চাটুয্যে মহাশয় যখন এর ভিতর আছেন, তখন বিষয়ের আশা নেই। তার উপর গৃহস্থঘরের মেয়ে–ধর্মটাও কি যাবে?

পরদিন তিনি মাধবীকে সমস্ত কথা বলিলেন। শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। জমিদার সুরেন রায়ের কথা সে সমস্ত দিন চিন্তা করিল। মাধবী ভাবিল, সুরেন রায়! নামটি বড় পরিচিত, কিন্তু লোকটির সহিত ত মিলিতেছে না। এ নাম সে কত দিন মনে মনে ভাবিয়াছে। সে আজ পাঁচ বৎসর হইল। ভুলিয়া ছিল–আবার বহুদিন পরে মনে পড়িল।

স্বপ্নে ও নিদ্রায় মাধবীর সে রাত্রি বড় দুঃখে কাটিল। অনেকবার পুরানো কথাগুলো মনে পড়িতেছিল, অনেকবার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল । সন্তোষকুমার তাহার মুখপানে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, মামীমা, আমি মা’র কাছে যাব।

মাধবী নিজেও কয়েকবার এ কথা ভাবিতেছিল, কেননা, এখানকার বাস যখন উঠিয়াছে, তখন কাশীবাস ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। সন্তোষের জন্য সে জমিদারের সহিত দেখা করিবে মনে করিয়াছিল কিন্তু তাহা হয় নাই। পাড়া-প্রতিবাসীরা নিষেধ করিতেছে। তা ছাড়া এখন যেখানেই সে যাক, একটা নূতন

ভাবনা, একটা নূতন উপসর্গ হইয়াছে। সেটা এই রূপ-যৌবনের কথা! মাধবী মনে করিল, পোড়াকপাল! এ উৎপাতগুলা কি এখনও দেহটায় লাগিয়া আছে! আজ সাত বৎসর হইল, এগুলা তাহার মনে পড়ে নাই, মনে করাইয়া দিতে

কেহ ছিল না। স্বামী মরিবার পর যখন বাপের বাড়ি ফিরিয়া গেল, তখন সকলে ডাকিল,'বড়দিদি', সবাই ডাকিল 'মা'! এই সম্মানের ডাকগুলি তাহার মনকে আরও বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ছাই রূপ-যৌবন! যেখানে তাহাকে বড়দিদির কাজ করিতে হইত, জননীর স্নেহ-যত্ন বিলাইতে হইত, সেখানে কি এসব কথা মনে থাকে! মনে ছিল না, মনে পড়িয়াছে তাই ভাবনাও হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই 'যৌবনে'র উল্লেখটা! লজ্জায় মলিন হাসি হাসিয়া কহিল, এখানকার লোকগুলা কি অন্ধ, না পশু! কিন্তু মাধবী ভুল করিয়াছিল–সকলেরই মন তাহার মত একুশ-বাইশ বছরে বৃদ্ধ হইয়া যায় না।

ইহার তিনদিন বাদে যখন জমিদারের পিয়াদা তাহার দ্বারপথে আসন করিয়া বসিল এবং হাঁক-ডাক করিয়া গ্রামবাসীকে জানাইতে লাগিল যে, সুরেন রায় আর একটা নূতন কীর্তি করিয়াছে, তখন মাধবী সন্তোষের হাত ধরিয়া দাসীকে অগ্রবর্তিনী করিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল।

বাটীর অদূরেই নদী; মাঝিকে কহিয়া দিল, সোমরাপুরে যাইতে হইবে। একবার প্রমীলাকে দেখিয়া যাইতে হইবে।

গোলাগাঁ হইতে পনর ক্রোশ দূরে সোমরাপুরে প্রমীলার বিবাহ হইয়াছিল। আজি এক বৎসর হইতে সে শ্বশুরঘর করিতেছে। সে হয়ত আবার কলিকাতায় যাইবে, কিন্তু মাধবী তখন কোথায় থাকিবে? তাই একবার দেখা করা।

সকালবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। স্রোতের মুখে নৌকা ভাসিয়া চলিল; বাতাস অনুকূল ছিল না, তাই ধীরমন্থর গমনে ক্ষুদ্র নৌকা বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া,শিয়াকুল ও বেতঝোপের কাঁটা বাঁচাইয়া,শরঝাড় ঠেলিয়া ধীরে ধীরে চলিল। সন্তোষকুমারের আনন্দ ধরে না! সে ছইয়ের ভিতর হইতে

হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা ও ডগা ছিঁড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাঝিরা কহিল, বাতাস না থামিলে, কাল দুপুর পর্যন্ত নৌকা সোমরাপুরে লাগিবে না।

আজ মাধবীর একাদশী, কিন্তু সন্তোষকুমারের জন্য কোথাও পানসি বাঁধিয়া,

পাক করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইবে। মাঝি কহিল, দিস্তেপাড়ার গঞ্জে নৌকা বাঁধিলে বেশ সুবিধা হইবে, সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায়।

দাসী কহিল, তাই কর বাপু, যেন দশটা-এগারটার মধ্যে ছেলেটা খেতে পায়।

# নবম পরিচ্ছেদ

কার্তিক মাস যায় যায়। একটু শীত পড়িয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের উপরের ঘরে জানালার ভিতর দিয়া প্রাতঃসূর্যালোক প্রবেশ করায় বড় মধুর বোধ হইতেছে। জানালার কাছে অনেকগুলি বাঁধা-খাতা ও কাগজপত্র লইয়া টেবিলের এক পাশে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন; আদায়-উসুল, বাকি-বকেয়া, জমা-খরচ, বন্দোবস্ত, মামলা-মকদ্দমার নথিপত্র সব একে একে উল্টাইয়া দেখিতেছিলেন। এসব দেখাশুনা একরকম আবশ্যকও হইয়া পড়িয়াছিল এবং না হইলে সময়ও কাটে না। শান্তির সহিত এ জন্য অনেকখানি ঝগড়া করিতে হইয়াছিল। অনেক করিয়া তবে তাহাকে সে বুঝাইতে পারিয়াছিল যে, অক্ষরের পানে চাহিলেই মানুষের বুকের ব্যথা বাড়িয়া যায় না, কিংবা তৎক্ষণাৎ ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। অগত্যা শান্তি স্বীকার করিয়াছে এবং আবশ্যকমত সাহায্যও করিতেছে।

আজকাল স্বামীর উপর তাহার পুরা অধিকার–তাহার একটি কথাও অমান্য হয় না। কোন দিনই হয় নাই, শুধু পাঁচজন হতভাগা ইয়ার-বন্ধু মিলিয়া দিন-কতক শান্তিকে বড় দুঃখ দিতেছিল। স্ত্রীর আদেশে সুরেন্দ্রের বাহির-বাটীতে পর্যন্ত যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শ ও উপদেশ শান্তি প্রাণপণে খাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছে।

এইমাত্র সে কাছে বসিয়া রাঙ্গা ফিতা দিয়া কাগজের বান্ডিল বাঁধিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ একখানা কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া সহসা ডাকিলেন, শান্তি!

শান্তি কোথায় গিয়াছিল–কিছুক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকছিলে?

হাঁ, আমি একবার কাছারিঘরে যাব।

না। কি চাই বল, আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

কিছু চাই না, একবার মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

তাঁকে ডাকিয়ে পাঠাই, তোমাকে যেতে হবে না। কিন্তু, এমন সময় তাঁকে কেন?

বলে দেব যে অগ্রহায়ণ মাস থেকে তাঁকে আর কাজ করতে হবে
না।

শান্তি বিস্মিত হইল; কিন্তু সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর অপরাধ?

অপরাধ যে কি, তা এখন ঠিক বলতে পার্‌চি না, কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি কর্‌চেন। তাহার পর আদালতের সার্টিফিকেট ও কয়েকখানা কাগজপত্র দেখাইয়া কহিলেন, এই দেখ, গোলাগাঁয়ে একজন বিধবার ঘর-বাড়ি সমস্ত বেনামী নিলামে খরিদ করে নিয়েচে। আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করেনি।

শান্তি দুঃখিত হইয়া কহিল, আহা বিধবা? তবে এ কাজটা ভাল হয়নি–কিন্তু বিক্রি হল কেন?

দশ বৎসরের খাজনা বাকি ছিল; সুদে-আসলে দেড়-হাজার টাকার নালিশ হয়েছিল।

টাকার কথা শুনিয়া শান্তি মথুরনাথের প্রতি একটু নরম হইয়া পাড়িল। মৃদু হাসিয়া কহিল, তা ম্যানেজারবাবুর বা দোষ কি? অত টাকা কেমন করে ছেড়ে দেন?

সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিল । শান্তি প্রশ্ন করিল, অত টাকা ছেড়ে দেবে?

দেব না ত কি, অসহায় বিধবাকে বাড়ি-ছাড়া করব? তুমি কি পরামর্শ দাও?

কথাটার ভিতর যতটুকু জ্বালা ছিল, সবটুকু শান্তির গায়ে লাগিল। অপ্রতিভ হইয়া দুঃখিতভাবে সে বলিল, না, বাড়ি-ছাড়া করতে বলি না। আর তোমার টাকা তুমি দান করবে, আমি তাতে বাধা দেব কেন?

সুরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, সে নয় শান্তি, আমার টাকা কি তোমার নয়? কিন্তু বল দেখি, আমি যখন না থাকব, তখন তুমি–

ও কি কথা–

তুমি–আমি যা ভালবাসি, তা করবে ত?

শান্তির চোখে জল আসিল, কেন না, স্বামীর শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, বলিল, ও কথা কেন বল?

বড় ভাল লাগে, তাই বলি। তুমি, আমার কথা, আমার সাধ ইচ্ছা জেনে রাখবে না শান্তি?

শান্তি চক্ষে অঞ্চল দিয়া মাথা নাড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন, আমার বড়দিদির

নাম।

শান্তি অঞ্চল সরাইয়া সুরেন্দ্রের মুখপানে চাহিল।

সুরেন্দ্র একখানা কাগজ দেখাইয়া বলিলেন, এই দেখ, আমার বড়দিদির নাম।

কোথায়?

এই দেখ, মাধবী দেবী যাঁর বাড়ি নিলাম হয়েছে।

একমুহূর্তে শান্তি অনেক কথা বুঝিল। কহিল, তাই বুঝি সমস্ত ফিরিয়ে দিতে চাইছ?

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, তাই হলে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব–সমস্ত–সব!

মাধবীর কথায় শান্তি একটু দুঃখিত হইয়া পড়িল; ভিতরে বোধ হয় একটু হিংসার ভাব ছিল। কহিল, তিনি হয় ত তোমার বড়দিদি নন। শুধু মাধবী নাম আছে। নামেতেই এই!

বড়দিদির নামের একটু সম্মান করব না?

তা কর, কিন্তু তিনি নিজে কিছু জানতে পারবেন না।

তা পারবেন না–কিন্তু আমি কি অসম্মান করতে পারি?

নাম ত এমন কত লোকের আছে।

আছে! তুমি দুর্গা নাম লিখে তাতে পা দিতে পার?

ছি! ও-কি কথা? ঠাকুর-দেবতার নাম নিয়ে–

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, ঠাকুর-দেবতার নাম নাই নিলাম, কিন্তু তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি, যদি একটি কাজ করতে পার।

শান্তি উৎফুল্ল হইয়া কহিল, কি কাজ?

দেয়ালের গায়ে সুরেন্দ্রনাথের একটি ছবি ছিল, সেই দিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই ছবিটি যদি–

কি?

চারিজন ব্রাহ্মণ দিয়ে নদীর তীরে পোড়াতে পার।

অদূরে বজ্রাঘাত হইলে লোকের যেমন প্রথমে সমস্ত রক্ত নিমেষে সরিয়া যায়, মুখখানা সর্পদষ্ট রোগীর মত নীলবর্ণ হইয়া থাকে, শান্তির প্রথমে সেইরূপ অবস্থা হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে মুখে-চোখে রক্ত ফিরিয়া আসিল–তাহার পর করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া সে নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। পুরোহিত ডাকাইয়া রীতিমত শান্তিস্বস্ত্যয়নের

ব্যবস্থা করিয়া রাজার অর্ধেক রাজত্ব মানত করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, এই বড়দিদি যিনিই হউন, ইহাঁর সম্বন্ধে সে আর কোন কথা কহিবে না । তাহার পরে ঘরে দ্বার দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে অশ্রুমোচন করিল। এ জীবনে এমন কটু কথা সে আর কখনও শোনে নাই!

সুরেন্দ্রনাথও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন,–কাছারিঘরে মথুরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলাগাঁয়ে কার সম্পত্তি নিলাম হয়েছে?

মৃত রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূর।

কেন?

দশ বছরের মাল-গুজারি বাকি ছিল।

কই খাতা দেখি?

মথুরানাথ প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেল; তাহার পর কহিল, খাতা-পত্র এখনও পাবনা থেকে আনা হয়নি।

আনতে লোক পাঠাও। বিধবার থাকবার স্থানটুকু পর্যন্ত রাখোনি?

বোধ হয় নেই।

তবে সে কোথায় থাকবে?

মথুরানাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, এতদিন যেখানে ছিল, সেখানে থাকবে বোধ হয়।

এতদিন কোথায় ছিল?

কলিকাতায়। তাহার পিতার বাটীতে।

পিতার নাম কি জান?

জানি। ব্রজরাজ লাহিড়ী।

বিধবার নাম?

মাধবী দেবী।

নতমুখে সুরেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া পড়িলেন। মথুরানাথ ভাবগতিক দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হল?

সুরেন্দ্রনাথ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, একটা ভাল ঘোড়া, শীঘ্র জিন কষিতে বল–আমি এখুনি গোলাগাঁয়ে যাব। এখান থেকে গোলাগাঁ কতদূর জান?

প্রায় দশ ক্রোশ।

এখন ন'টা বেজেছে–একটার মধ্যে পৌঁছতে পারব।

ঘোড়া আসিলে তাহাতে চড়িয়া বসিয়া কহিলেন, কোন্ দিকে?

উত্তর দিকে, পরে পশ্চিমে

যেতে হবে।

তাহার পর চাবুক খাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ কথা শুনিয়া শান্তি ঠাকুরঘরে মাথা খুঁড়িয়া রক্ত বাহির করিল,–ঠাকুর,এই তোমার মনে ছিল! আর কি ফিরে পাব!

তাহার পর দুজন পাইক ঘোড়ায় চড়িয়া গোলাগাঁ উদ্দেশে ছুটিয়া গেল। জানালা দিয়া তাহা দেখিয়া শান্তি ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল–মা দুর্গা! জোড়া মোষ দেব–যা চাও, তাই দেব–তাঁকে ফিরিয়ে দাও–বুক চিরে রক্ত দেব–যত চাও–হে মা দুর্গা, যত চাও–যতক্ষণ না তোমার পিপাসা মিটে।

গোলাগাঁ পৌঁছিতে আর দুই ক্রোশ আছে। অশ্বের ক্ষুর পর্যন্ত ফেনায় ভরিয়া গিয়াছে। প্রাণপণে ধূলা উড়াইয়া, আল ডিঙ্গাইয়া,খানা টপকাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য।

ঘোড়ার উপর থাকিয়াই সুরেন্দ্রের গা–বমি বমি করিয়া উঠিল; ভিতরের প্রত্যেক নাড়ী যেন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবে! তাহার পর টপ্ করিয়া ফোঁটা দুই-তিন রক্ত কষ বহিয়া ধূলিধূসরিত পিরানের উপর পড়িল; সুরেন্দ্রনাথ হাত দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিলেন । একটার পূর্বেই গোলগাঁয়ে উপস্থিত হইলেন। পথের ধারে দোকানে জিজ্ঞাসা করিলেন,এই গোলাগাঁ?

হ্যাঁ।

রামতনু সান্যালের বাটী?

ঐ দিকে।

আবার ঘোড়া ছুটিল। অল্পক্ষণে বাঞ্ছিত বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

দ্বারেই একজন সিপাহী বসিয়াছিল; প্রভুকে দেখিয়া সে প্রণাম করিল।

বাটীতে কে আছেন?

কেউ না।

কেউ না? কোথায় গেলেন?

ভোরেই নৌকা করে চলে গেছেন।

কোথায়–কোন্ পথে?

দক্ষিণ দিকে।

নদীর ধারে ধারে পথ আছে? ঘোড়া দৌড়তে পারবে?

বলতে পারি না। বোধ হয় নেই।

পুনর্বার ঘোড়া ছুটিয়া চলিল। ক্রোশ-দুই আসিয়া আর পথ নাই। ঘোড়া চলে না। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া তখন

সুরেন্দ্রনাথ পদব্রজে চলিলেন। একবার চাহিয়া দেখিলেন–জামার উপর অনেক ফোঁটা রক্ত ধূলায় জমিয়া গিয়াছে। ওষ্ঠ বাহিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে। নদীতে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন, তার পর প্রাণপণে ছুটিয়া চলিলেন। পায়ে আর জুতা নাই–সর্বাঙ্গে কাদা, মাঝে মাঝে শোণিতের দাগ! বুকের উপর কে যেন রক্ত ছিটাইয়া দিয়াছে।

বেলা পড়িয়া আসিল। পা আর চলে না– যেন এইবার শুইতে পারিলেই জন্মের মত ঘুমাইয়া পড়িবে–তাই যেন অন্তিম শয্যায় এই জীবনের মহা-বিশ্রামের আশায় সে উন্মত্তের

মত ছুটিয়া চলিয়াছে। এ দেহে যতটুকু শক্তি আছে, সমস্ত অকাতরে ব্যয় করিয়া শেষশয্যা আশ্রয় করিবে, আর উঠিবে না!

নদীর বাঁকের পাশে–একখানা নৌকা না? কলমীশাকের দল কাটিয়া পথ করিতেছে! সুরেন্দ্র ডাকিল, 'বড়দিদি '! শুষ্ককণ্ঠে শব্দ বাহির হইল না–শুধু দুই ফোঁটা রক্ত বাহির হইল।

'বড়দিদি '– আবার দুই ফোঁটা রক্ত ।

কলমীর দল নৌকার গতি রোধ করিতেছে। সুরেন্দ্রর কাছে আসিয়া পড়িল।

আবার ডাকিল, 'বড়দিদি'।

সমস্ত দিনের উপবাস ও মনঃকষ্টে মাধবী নির্জীবের মত নিদ্রিত সন্তোষকুমারের পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল। সহসা কানে শব্দ পোঁছিল : পুরাতন পরিচিত স্বরে–কে ডাকে না!

মাধবী উঠিয়া বসিল। ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। সর্বাঙ্গে ধূলা-কাদা-মাখা–মাষ্টারমহাশয় না?

ও নয়নতারার মা, মাঝিকে শীগগির নৌকা লাগাতে বল্।

সুরেন্দ্রনাথ তখন ধীরে ধীরে কাদার উপর শুইয়া পড়িতেছিলেন।

সকলে মিলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া নৌকায় তুলিয়া আনিল। মুখে-চোখে জল দিল। একজন মাঝি চিনিত, সে কহিল, লাল্তাগাঁয়ের জমিদার। মাধবী ইষ্ট-কবচসুদ্ধ স্বর্ণহার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া লইয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, লাল্তাগাঁয়ে

এই রাত্রে পৌছঁতে পার? সবাইকে এক-একটা হার দেব।

সোনার হার দেখিয়া তাহাদের মধ্যে তিনজন গুণ ঘাড়ে লইয়া নামিয়া পড়িল।

মাঠাকরুন, চাঁদনি রাত; ভোর নাগাদ পোঁছে দেব।

সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া তিনি মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন! মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই, শুধু কপালের কিয়দংশ অঞ্চলে ঢাকা। ক্রোড়ের উপর সুরেন্দ্রর মাথা লইয়া মাধবী বসিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, তুমি বড়দিদি?

অঞ্চল দিয়া মাধবী সযত্নে তাহার ওষ্ঠ-সংলগ্ন রক্তবিন্দু মুছাইয়া দিল, তাহার পর আপনার চোখ মুছিল।

তুমি বড়দিদি?

আমি মাধবী।

সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, আঃ–তাই!

বিশ্বের আরাম যেন এই ক্রোড়ে লুকাইয়াছিল। এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। অধরের কোণে সরক্ত হাসি তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে–বড়দিদি, যে কষ্ট!

তর্তর্ ছল্ছল্ করিয়া নৌকা ছুটিয়াছে। ছইয়ের ভিতর সুরেন্দ্রের মুখের উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে। নয়নতারার মা একটা ভাঙ্গা পাখা লইয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিলেন, কোথায় যাচ্ছিলে?

মাধবী ভগ্নকণ্ঠে কহিল, প্রমীলার শ্বশুরবাড়ি।

ছিঃ–এমন করে কি কুটুমের বাড়ি যেতে আছে দিদি?

# দশম পরিচ্ছেদ

নিজের অট্টালিকায়, তাহার শয়নকক্ষে, বড়দিদির কোলে মাথা রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আছে। পা-দুটি শান্তি কোলে করিয়া অশ্রুজলে ধুইয়া দিতেছে। পাবনায় যতগুলি ডাক্তার-কবিরাজ সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রমেও রক্ত বন্ধ করিতে পারিতেছে না। পাঁচ বৎসর পূর্বেকার সেই আঘাতে এখন রক্ত বমন করিতেছে।

মাধবীর অন্তরের কথা খুলিয়া বলিতে পারিব না। আমি নিজেও ভাল জানি না, বোধ করি, তাহার পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা মনে পড়িতেছে। বাড়ি হইতে সে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আর ফিরাইতে পারে নাই; পাঁচ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

সন্ধ্যার পর উজ্জ্বল দীপালোকে সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর মুখের পানে চাহিল। পায়ের কাছে শান্তি বসিয়া আছে, সে যেন শুনিতে না পায়–হাত দিয়া তাই মাধবীর মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, বড়দিদি, সেদিনের কথা মনে পড়ে, সেদিন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি তাই এখন শোধ নিয়েছি, তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কেমন, শোধ হল ত?

মুহুর্তের মধ্যে মাধবী চৈতন্য হারাইয়া লুণ্ঠিত-মস্তক সুরেন্দ্রের স্কন্ধের পার্শ্বে রাখিল,– যখন জ্ঞান হইল, তখন বাটীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।